EKANTEY

Chanakya Sen

Rupees Six only.

একান্তে

চাণক্য সেন
এবং
সাহিত্য-আসরে যোগদানকারী
পাঠক পাঠিকাগণ।



ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই লেখকের—

ধীরে বহে নীল
রাজপথ জনপথ
সে নহি সে নহি
মুখ্যমন্ত্রী
তিন তরঙ্গ
সমুদ্র শিহর
মধ্যপঞ্চাশ ইত্যাদি।

সবাই রাজা

বড়-অসময়ে-পরলোকগত প্রসাদ সিংহের অনুরোধ ছিল, 'উল্টোরথে' নিয়মিত একটি সাহিত্য-কলম গ্রহণ করি। মূলত রাজী হয়েও ইতস্তত করছিলাম। তাঁর শেষ চিঠিতে অনুরোধটি পুনর্বার উত্থাপিত হওয়ায় লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করছিলাম। প্রসাদ সিংহের সেই পত্রের জবাব দিতে পারার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর শেষ অনুরোধ আমার পক্ষে আর উপেক্ষণীয় রইল না। 'উল্টোরথে'র সহঃসম্পাদক রবি বসুকে জানালাম, লিখতে রাজী। জবাব এল, 'একথা যদি প্রসাদ-দা-কে শোনাতে পারতুম...'

সাহিত্য-কলম লিখবার ইচ্ছে অনেককালের। তবু ইতস্তত করবার যথেষ্ট কারণ ছিল, এখনও আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, অযোগ্যতা। আমি যা লিখব, পাঠক তা পঠনযোগ্য মনে করবেন, এমন ভরসা কোথায়? প্রত্যেকখানা উপন্যাস রচনার আগেও এ দুশ্চিন্তা আমায় পেয়ে বসে। আগে সৃষ্টি করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, তবে তো নতুন উপন্যাস! আমার ছদ্মনাম, ঠিকানা-গোপন অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করেও প্রকাশকদের কাছ থেকে তাগাদা আসে, আসে অনুরোধ। উপন্যাস চাই। তাঁদের দোষ নেই। বঙ্গসাহিত্য আজ যাঁদের অতি-প্রসবে সমৃদ্ধ, যাঁরা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বছরে চার ডজন গল্প এবং আধ-ডজন উপন্যাস লেখেন, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু সে আভিজাত্য আমার কাম্য নয়, নাগালের মধ্যেও নয়। আমার একখানা উপন্যাস লিখতে কম ক'রে এক বছর লাগে; তাতেও অতৃপ্ত থেকে যাই, মনে হয় কিছু অংশ নতুন ক'রে লিখলে ভাল হত, আরও কিছু পরিমার্জন দরকার ছিল

ভাষার, আরও কিছু পড়তে পারলে, আর একটু ঘুরে দেখতে পারলে বুঝি-বা ফাঁক ও ফাঁকিগুলো কম থাকতো। বিদেশীরা তিন-চার বছরের কমে একখানা উপন্যাস শেষ করবার কথা ভাবতেও পারেন না—যাঁদের সাহিত্যরচনায় নিষ্ঠা ও উচ্চাশা আছে, তাঁরা। আমার এক তরুণী পাঠিকা পত্রযোগে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি এত কম লেখেন কেন বলুন তো?' সে প্রশ্নের উত্তর, বছর দুই বাদ, আজ দিচ্ছি: 'অনেকদিন, যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন, যতোদিন লিখতে পারি ততোদিন, এমন কিছু লিখতে চাই, যা পড়বার জন্যে আপনাদের অন্ততঃ কিছুটা আগ্রহ থাকবে।'

এ প্রসঙ্গে প্রসাদ সিংহ-কে স্মরণ করা যেতে পারে। 'উল্টোরথে' যে-সব প্রতিষ্ঠাবান লেখক প্রসাদ-সিংহ-প্রশস্তি করেছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা-স্বীকার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখতে পেলাম। প্রসাদ সিংহ-ই বাংলা-সাহিত্য-বাজারে গল্প-উপন্যাসের দাম বাড়িয়েছিলেন। পছন্দসই লেখককে 'ব্ল্যাংক চেক' পর্যন্ত দিতে তাঁর হৃদকম্প হ'ত না, হাত কুঁচকে যেতো না। এ-খবরটা আমার আগে জানা ছিল না; আমি বাংলাদেশের অনেক দূরে বাস করি, সাহিত্য-বাজারের হাঁড়ির খবর আমার জানা নেই। তবে এটুকু জানি যে সাহিত্য-রচনা বা পুস্তক-লিখন জীবিকা হিসেবে গ্রহণ ক'রে জাত রেখে চলার সৌজন্য আমাদের এ শতাব্দীতে অর্জনীয় হবার সম্ভাবনা নেই। তার মানে এই নয় যে বাংলা সাহিত্য সম্বল ক'রে বেঁচে আছেন, এবং বেশ ভালোই বেঁচে আছেন, এমন লোক একান্ত অনুপস্থিত। মানে এই, যাঁরা সাহিত্যকেই একমাত্র জীবিকা ব'লে গ্রহণ করেছেন, বেঁচে থাকবার জন্যে অতি-উৎপাদন তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। হিসেব ক'রে দেখেছি, যদি আপনি বিক্রির দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর লেখক হন, অর্থাৎ বছরে আপনার উপন্যাস দু-তিন-হাজার কপি বিক্রি হয়, তাহলে, মাসে গড়পড়তা

পাঁচশ' টাকা আয় করবার জন্যে, আপনাকে অন্তত বছরে তিনখানা উপন্যাস লিখতে হবে! এবং, বেঁচে থাকার অসংখ্য হঠাৎ-জুলুম মেটাবার জন্যে, যতো বেশি পারেন, ছোট গল্প। যাতে আপনার গল্প ও উপন্যাস ছায়াচিত্রে প্রতিভাত হয়, সেজন্যে আপনাকে বাড়তি প্রচেষ্টাও করতে হবে। এই ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশা পরিশ্রমের চেয়ে দপ্তরে চাকরী করা কি অনেক বেশি ভালো নয়?

'ভয়ংকর ও সর্বনাশা' বলছি কেন, শুনুন। আমাদের সীমিত-অভিজ্ঞতার স্বল্প-শক্তি জীবনে এমন নিশ্চয় কিছু অর্জন নেই, যার জোরে এই প্রবল সৃষ্টি-বন্যা বইয়ে দেওয়া সম্ভব। সাহিত্যিকের পত্নী একটি সন্তান প্রসব করতে দশমাস সময় নেন, অথচ সাহিত্যিক দশমাসে তিনখানি উপন্যাস পয়দা করেন। এই অতি-সৃষ্টির দাম দিতে গিয়ে তাঁকে একই কাহিনী, একই ভাষায়, একটু এ-দিক ও-দিক পালটিয়ে, বার বার পরিবেশন করতে হয়। না কাহিনী, না চরিত্র, না উপন্যাসের সংগঠন তাঁর উপযুক্ত সময় ও মনোযোগ দাবী করতে পারে। এবং যে-গদ্য তিনি রচনা করেন, তা তরল, বেতাল এবং অসংবদ্ধ হ'তে বাধ্য। বর্তমান বাংলা গদ্য নিয়ে অনুশীলন করলে দেখতে পাবেন আমরা, আজকালকার সাহিত্যিকরা, গদ্যকে কোন্ স্থূলতায়, কি ভয়ানক তরলতায়, নামিয়ে নিয়ে এসেছি।

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের দুর্দশা অনেক, কিন্তু লেখকদের অবস্থা বুঝি সবচেয়ে শোচনীয়। নিজের কথা বলছি, বাঙ্গালী লেখক বলে পরিচয় দিতে আমার মনে তৃপ্তি আসে না। বলতে চাই, আমি ভারতীয় লেখক। ভারতীয় লেখক, কিন্তু লিখি বাংলা ভাষায়। অন্য সব ভারতীয় লেখকরা লেখেন হিন্দীতে, তামিল-তেলুগু-মারাঠী-গুজরাতী ইত্যাদি ভাষায়। এই বিরাট পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের দেশে আমার লেখা একমাত্র বাঙ্গালী ছাড়া কারুর কাছে পৌঁছতে পারছে না। অথচ আমি তো বাংলাদেশ বা বাঙ্গালী-জীবন নিয়ে লিখছি না—আমি লিখছি আজকের ভারতবর্ষ নিয়ে।

লেখক হিসেবে আমাদের সবাকার, এই হল সবচেয়ে বড় শৃঙ্খল। এই দুর্ভেদ্য ভাষার বিভেদ যদি না থাকতো, ভারতবর্ষে যদি এক ভাষা থাকতো, তাহলে, বর্তমান শতকরা ত্রিশ জন অক্ষরজ্ঞানী নিয়েও, আমরা লেখকরা কেবলমাত্র লিখে, এবং বছরে তিনখানা উপন্যাস ও তিন-কুড়ি গল্প না লিখে, ভালোভাবেই বেঁচে থাকতে পারতাম।

আজকের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। এই তো সেদিন কেরল রাষ্ট্রে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন হয়ে গেল। শ' তিনেক প্রখ্যাতনামা লেখকরা একত্রিত হলেন। কিন্তু ক'জন ক'জনের সৃষ্টির খবর রাখেন? গুজরাতের উমাশঙ্কর যোশী কি জানেন বাংলার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন কি উপন্যাস লিখেছেন? কেরলের যে-কবি ক'দিন আগে লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন, আমরা ক'জন বাঙ্গালী তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত? আজকের দিনে বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যপ্রদেশে রোজগার করতে পারেন, গুজরাতী এনজিনীয়র দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় চাকরী পান, অসমীয়া আই. এ. এস মাদ্রাজের জিলা-শাসক হতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালী, হিন্দী, তামিল-তেলুগু-মারাঠী-গুজরাতী লেখক কবিদের স্বভাষী-অঞ্চলের বাইরে বেঁচে থাকতে হলে সাহিত্য ছাড়া অন্য জীবিকা অন্বেষণ অনিবার্য।

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে সাহিত্য আকাদমী তার বাৎসরিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। ফেব্রুয়ারীতে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং পুরস্কৃত সাহিত্যিকদের সম্মানিত করেন। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে বছরের সেরা কিছু ঔপন্যাসিক, সমালোচক, জীবনীকার, কবি এবং প্রবন্ধকার দিল্লীতে সমবেত হন। এঁরা একে অন্যের পানে তাকান অপরিচয়ের সংকোচে—কারুর সৃষ্টির সঙ্গে কারুর বড় একটা পরিচয় নেই। ভারতবর্ষের সাহিত্যমানস খণ্ড খণ্ড হয়ে সারিবদ্ধ দাঁড়ায়, জোড়া লাগবার সুযোগ পায় না।

গতবছর ফেব্রুয়ারী মাসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আকাদমী

পুরস্কার নেবার জন্যে দিল্লী এসেছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় তাঁর সম্বর্ধনা হয়েছিল—কিন্তু কাদের কাছে? প্রধানত, দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে। রাজনৈতিক কারণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি বাঙ্গালী সমাজের বাইরেও পরিব্যাপ্ত—কিন্তু বাংলার বাইরে তাঁর কবিতা এখনও অপঠিত। এই এ-বছর তাঁর প্রথম কবিতার বই হিন্দীতে ছাপবার ব্যবস্থা হয়েছে—কিন্তু হলেই বা? ভারতবর্ষ তো বাংলা ও হিন্দীই শুধু নয়!

তাই দেখুন, ভারতবর্ষের আর সব আছে—কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য নেই। আমাদের ভারতীয় কৃষি আছে, শিল্প আছে, সরকার আছে, রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে, দুর্নীতি আছে, সব আছেঃ ভারতীয় সাহিত্য নেই, ভারতীয় লেখক নেই। এখনও যাঁরা সর্বভারতে পঠিত হতে চান, তাঁরা লেখেন ইংরেজীতে—এবং ইংরেজী জানা মানুষ ভারতবর্ষে শতকরা পাঁচ জন। আমরা, ভারতবর্ষের নানা আঞ্চলিক ভাষার লেখকরা, যে যার কূপে বাস করছি, অতি-উৎপাদনে কূপের জল পংকিল করছি। এবং, কূপমণ্ডুকতার জন্যেই, আমাদের সাহিত্য-রচনায় নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা দিন দিন চলে যাচ্ছে—আসছে অহংকার, দম্ভ, পরশ্রীকাতরতা এবং কুৎসিত ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা।

এবার আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না, কেন বাংলাদেশে সাহিত্য-সমালোচনা উঠে গেছে। আমরা প্রশংসা চাই, সমালোচনা চাই নে। স্বলিখিত বই-এর বিজ্ঞাপন পাঠ করে আমরা শিহরিত, পুলকিত, উদ্বেলিতঃ সত্যি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রত্যেক রচনা—বছরে তিন থেকে ছ'খানা হলেও—অভিনব, শাশ্বত, এ-শতকের শ্রেষ্ঠ-বলিষ্ঠ, বরণীয়, স্মরণীয়, দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এবং নতুন পদক্ষেপ।

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই লেখার রাজত্বে।

জবাব নেই

পুণ্যতীর্থ বারাণসীর সংলগ্ন গ্রাম রাজঘাট। এখানে, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিস। 'গান্ধীয়ান' বিশেষণ বহুলাংশে অঙ্গভূষণ মাত্র; গান্ধীবাদ-প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এ শিক্ষণায়তনের এমন কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। এখানকার যুগ্মাধ্যক্ষ ডাঃ সুগত দাশগুপ্ত এবং দিল্লী-কেন্দ্রিক প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ শ্রীচঞ্চল সরকারের একত্রিত উদ্যোগে রাজঘাট শিক্ষায়তনে বর্তমানে একটি সেমিনার বসেছে। আলোচ্য বিষয়ঃ সংবাদপত্রে গ্রামের ছবি।

'উল্টোরথে'র পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আমার আলোচ্য বিষয় প্রধানত সাহিত্য। সংবাদপত্রসাহিত্য নামে আজকাল যে বিরাট দেশব্যাপী মহাপ্রতিষ্ঠান, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য কোথায়? বহুদিন আগে, অন্য-দুনিয়ায়, অস্কার ওয়্যাইল্ড বলেছিলেন, সংবাদপত্রসাহিত্য, অর্থাৎ জার্নালিজম, অপঠনীয়। আন্‌রীডেবল। আর আমাদের যুগে, এ-দুনিয়ায়, কাম্যু বলেছেন, আজকের মানুষ প্রধানত দুটি কর্মে ব্যস্তঃ দে ফর্নিকেট্ অ্যাণ্ড রীড নিউজপেপার্স। প্রথমটার কথা ছেড়ে দিলাম; কিন্তু সংবাদপত্র নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বেশির ভাগ যেমন আইন ও আদালতের সার্থক বা ব্যর্থ সন্তান, সহিত্যিকদের মধ্যেও অনেকে তেমনি সংবাদপত্রের সঙ্গে পেশাগত অথবা পয়সা-গত ভাবে সংযুক্ত। দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে

সাহিত্য-পরিবেশন কেবল ভারতীয় প্রথা নয়। পৃথিবীর সর্বত্র এ-প্রথা চালু।

ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীপুরুষ রাজঘাটে যে-সেমিনারে একত্রিত হয়েছেন তার মধ্যে কেবল একজনই সাংবাদিকতা ছাড়া সাহিত্যরচনাও করে থাকেন। তবে তাঁর সৌভাগ্য, এই পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর নাম যদি বা শুনে থাকেন, তাঁর বই পড়েন নি বললেই চলে।

চারদিন ধরে এই যে বৈঠক চলছে, তাতে আলোচনা হচ্ছে গ্রামীন পরিবর্তনের কতটুকু, কি-ধরনের চিত্র সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা বিরাশি জন গ্রামবাসী; অথচ এদের পরিবর্তনশীল কিংবা অপরিবর্তিত জীবনের কতটুকু রোজকার সংবাদপত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়? আপনাদের মধ্যে যাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পাঠ করেন, গত তিন মাসে তাঁরা পশ্চিম বাংলার গ্রামীন জীবনের ওপর বেশ কিছু তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত সমাচার-নিবন্ধ পড়ে থাকবেন, বিশেষত লেভী প্রথা, খাদ্যাভাব, কেরোসিনের অভাবে গ্রামজোড়া জমাট অন্ধকার, বরগাদারীপ্রথার প্রস্তাবিত বিলোপের সম্ভাব্য পরিণাম, পঞ্চায়েৎ, বীজ-খামার ইত্যাদি বিষয়ে। আপনাদের নিশ্চয় মনে হয়নি যে এ-সব খবর 'খবর' নয়ঃ বরং, আশা করি, মনে হয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের ক্লান্তিহীন পুনরুক্ত বাণীর বদলে 'আনন্দবাজার' নতুন ধরনের গ্রাম্য খবর পরিবেশন করে সংবাদপত্র হিসেবে উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অথচ 'আনন্দবাজারে'র নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী 'যুগান্তর' গ্রাম সম্বন্ধে নতুন সাংবাদিকতার তুলনীয় প্রচেষ্টা দেখান নি। 'আনন্দবাজারে'র প্রশংসা করছি বটে, কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। ডিসেম্বর মাসে আনন্দবাজারের খবরে দেখেছিলাম, বসিরহাটে

এমন নিদারুণ খাদ্যাভাব যে মানুষ ঘটি-বাটি বিক্রি করছে, এমন কি চাষের জমি বেচবার জন্যে দলে দলে কাছারিতে হাজির হচ্ছে। খবরটা কিন্তু চার-পাঁচ লাইনের, পত্রিকার অন্তর্দেশে এক কোণে নির্বাসিত। কারুর হয়তো চোখেও পড়েনি; কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় নজর দেবার মত এমন-কিছু মনে করেন নি। অথচ দু-মাস পরেই বসিরহাট সর্বভারতীয় খবর হয়ে দাঁড়াল। আমার বলবার কথা হল: 'আনন্দবাজার' যদি ডিসেম্বরে বসিরহাটের ওপর সামান্য কৃপাদৃষ্টিও বর্ষণ করতেন, বহু মানুষের ক্ষুধা দুমাস পরে হয়তো অমন হিংসাত্মক আকার ধারণ না-ও করতে পারত।

গ্রাম নিয়ে আমাদের সংবাদপত্রগুলির বেশি মাথা ঘামাবার বাধ্যতামূলক কারণ নেই। দৈনিক, সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্তাহিক, মাসিক, সব সংবাদপত্রের যা পুরো প্রচার, তার শতকরা দুখানা মাত্র গ্রামে পৌঁছয়। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের ছ' লক্ষ গ্রামের প্রত্যেকটি একখানা করেও সংবাদপত্র পায় না। বারাণসীর কাছাকাছি চারখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধে দেখতে পেলাম, দুখানা সংবাদপত্র পায়, দুখানা পায় না। গ্রাম থেকে, দেখতে পাচ্ছেন, সংবাদপত্রগুলি, বিশেষত বৃহৎ ইংরেজী খবরের কাগজগুলি, না পায় পাঠক, না বিজ্ঞাপন। পাঠক বাড়াবার রাস্তাও বন্ধ, নিউজপ্রিন্ট নেই, অদূর ভবিষ্যতে এ অভাব দূরও হবার নয়। অবশ্য এমন সংবাদপত্রও আছেন, যেমন বারাণসীর হিন্দী পত্রিকা 'আজ', যার পাঠককুলের শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন গ্রামীন: অবশ্য এদের মধ্যে তহশীল শহরও যুক্ত। দেখা যাচ্ছে, যে সব রাষ্ট্রে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত সর্বগ্রাসী বিরাট নগরী নেই—যেমন ধরুন, উত্তর প্রদেশ, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পঞ্জাব—সেখানে পত্রিকাগুলির গ্রামীন পাঠক বেশি।

কিন্তু হলে কি হবে? গ্রাম থেকে সংবাদ পাবার রাস্তা যে

ভীষণ পঙ্গু। আমাদের দেশে সর্বসমেত মোটামুটি পাঁচ হাজার সংবাদপত্র আছে: তার মধ্যে শতকরা প্রায় আটাশিটির প্রচার মাত্র পাঁচ হাজারের মধ্যে: এই যে অতিশয় সংখ্যাধিক মফস্বল প্রেস, এর না আছে অর্থ, না উন্নত দৃষ্টি, না উপযুক্ত পরিচালনা, না প্রশংসাজনক সম্পাদনা। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে পাঠক-সমাজের যে সামান্য অংশ উদ্বৃত্ত রাখেন, এঁরা তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন।

আমাদের দেশে অনেক মজার মধ্যে একটা হল: ওপর থেকে নীচের দিকে অনর্গল বাণী ও তথ্য প্রসারিত হয়, নীচের দিক থেকে ওপর দিকে খুব সামান্যই উঠে আসে। গ্রামবাসীকে কি করতে হবে, নেতারা ও সরকার প্রতিদিন তা উদাত্ত পুনরুক্তিতে ঘোষণা করেন; সংবাদপত্রের আতিথেয়তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত হতে দেখি না। কিন্তু গ্রাম থেকে খবর বয়ে আনবার—যে খবরে গ্রামীন জীবনের সত্যিকার জীবন্ত ছবি ভেসে ওঠে—আয়োজন কি দারুণ দরিদ্র। যে দুটি জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়েছেন—পি. টি. আই. ও ইউ. এন. আই.—তাঁরা গ্রামীন সংবাদ পরিবেশন করেন না বললেই হয়। করেন, যখন কোনও নেতা গ্রামে পদার্পণ করে নিজের ও গ্রামবাসীর গৌরব বাড়ান। সুতরাং, গ্রাম থেকে সংবাদ আনবার ব্যবস্থা সংবাদপত্রগুলির নিজেদেরই করতে হয়। এবং একে তো জিলা শহরের বাইরে সংবাদদাতা প্রায়ই থাকে না, তা ছাড়া, জিলা সংবাদ-দাতাগণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্ট-টাইম কাজ করেন, এবং তাঁরা ঠিক গ্রামীন লোক নন। এদিক থেকেও বাংলাদেশের ব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক অগ্রসর। সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে দেখতে গেলে জিলা সংবাদ-দাতাগণ গড়পড়তা দশ থেকে পঞ্চাশ টাকা "সম্মান দক্ষিণা" পান, এবং তাঁরা আসেন শহুরে শ্রেণী থেকে—হয় কলেজের অধ্যাপক, নয় স্কুলের শিক্ষক, নয় উকিল। এ ব্যবস্থার অনেক

দোষ আছে—এদের বেশিরভাগই সরকার-খুশি সংবাদ পরিবেশন করেন, নয়তো স্থানীয় রাজনৈতিক দলবাজির দৃষ্টিতে রিপোর্ট লেখেন; এক একটা জিলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের সঙ্গে আত্মীক সম্পর্ক এঁদের সামান্য, গ্রামের সমস্যা নিয়ে সুলিখিত, আকর্ষণীয়, তথ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ পাঠাবার ক্ষমতা থেকে বেশির ভাগ এঁরা বঞ্চিত। এঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা নেই, হেড অফিস থেকে নিয়মিত নির্দেশও এঁরা পান না। ফলে পাঠক হিসেবে আপনারা পান নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ 'জিলা খবর' বা 'মফস্বল বার্তা'। য়ুরোপ, আমেরিকায় অনেক ধুরন্ধর সাংবাদিকের হাতের অক্ষর পরিচয় হয় গ্রামে বা ছোট শহরে—অনবরত ছোট পত্রিকা থেকে যোগ্য, চোখ-মন-ঝলকান সাংবাদিকরা শহুরে বড় পত্রিকায় স্নাতকোত্তর হন। আমাদের দেশে এ প্রথা এখনও প্রবর্তিত হয়নি। জিলা-সাংবাদিকদের মধ্যে খুব কমই সাংবাদিকতা পূর্ণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গ্রাম বলতে আমরা মহাস্থবির এক অচলায়তনের কল্পনা করি। এ কল্পনা কিন্তু অবাস্তব। গ্রামের জীবন নানা দিকে নানা ভাবে প্রতি বছর বদলাচ্ছে, অথচ এই অফুরন্ত জীবন-নাট্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কি ভীষণ সামান্য। গ্রামে গ্রামে যে ক্ষিপ্র বেগে শিক্ষার দাবি বাড়ছে, শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, তাও আশ্চর্যজনক। পঞ্জাবের গ্রামে গেলে দেখবেন জীবন কি দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রতিদিন অগ্রসর হচ্ছে গুজরাতে এমন কমই গ্রাম আছে যেখানে বাস চলে না, ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। পঞ্চায়েৎ চালু হবার পরে এই ক'বছরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাবি-কাঠিও অনেকখানি শহর থেকে গ্রামে চলে এসেছে। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস যে দুই প্রধান দলে বিভক্ত, তার শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে সারা রাষ্ট্রে—প্রতিটি পঞ্চায়েতে। এখন চন্দ্রভানু গুপ্ত ও কমলাপতি ত্রিপাঠি হাত মেলবার ইচ্ছে পোষণ করলেও, জিলা, মহকুমা ও

গ্রাম পঞ্চায়েতের সমর্থকদের অগ্রিম অনুমতি ও সম্মতি নিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গেও দেখতে পাবেন কংগ্রেসের দলাদলি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। বহুদিন গেছে, যখন সর্বভারতীয় এক নেতা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্ব করে গেছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ। এবং মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের চাবিকাঠি জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েৎ প্রধানদের হাতে।

যে-দিকে তাকান, গ্রামের বর্ধমান দাপট অনুভব করতে পারবেন। আমাদের সরকারের অর্থনীতি, খাদ্যনীতি, বহুলাংশে নির্ধারণ করছে গ্রামের জোরাল চাষীদের সংঘবদ্ধ স্বার্থ। বড় বড় মিল-মালিক-পুঁজিপতিরা যদি-বা কেউ কেউ স্বতন্ত্র পার্টিকে সমর্থন করেন, ধনী ও মাঝারী চাষী আজও কংগ্রেসের প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গে এই যে লেভী নিয়ে এত বাক-বিতণ্ডা, একে ঘিরে যে বিরাট নাটক চলছে তার মুখ্য চরিত্রে অবতীর্ণ জোতদার, বড় চাষী, মাঝারি চাষী, ভাগ-চাষী, উকিল, প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ, সুদ-খেকো মহাজন, পাকা-পোক্ত ব্যাপারী, নবজাত কো-অপারেটিভ এবং শঙ্কিত দালাল। এই নাটক চলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র। এবং এ অভিনয় সহজে শেষ হবার নয়। মঞ্চভূমিতে, এ ধারাবাহিক অভিনয়ের মধ্যে, দেখতে পাবেন কতো নতুন ধরনের চরিত্রের আবির্ভাব হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলীয় রাজনীতির সত্যিকারের চেহারা---বাইরের নয়—বদলে যাবে।

অথচ এ নাটকের কতোটুকু সংবাদপত্রের মারফৎ আমরা জানতে পারছি! জানতে পারছি কি, পঞ্চায়েৎগুলি কি করছে কি না করছে, কারা তাদের চালাচ্ছে—কি ধরনের নতুন রাজনীতি তৈরি হচ্ছে গ্রামে গ্রামে? জানতে পারছি কি, কি ধরনের পাঠ্যপুস্তক গ্রামের স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থাই বা কি? অথবা, কোনগ্রামে নতুন রাস্তা হল, কোথায় বসল নতুন হাট? অথবা,

কি উৎসব আনন্দ গ্রামবাসীর জীবনে আলোর ঝিলিক আনল? জানতে কি পারছি, বীরভূমে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে হিন্দুরা মৃতদেহ সৎকার করবার পয়সা যোগাড় করতে পারে না? অথবা, গ্রামের লোকেদের পানীয় জল আছে কি নেই; অথবা, বাল্যবিবাহ কি এখনও চলছে? শুনতে পাই, পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা জোর কার্যকরী হচ্ছে, কিন্তু তার কোনও সজীব, সচেতন বিবরণ তো সংবাদপত্রে চোখে পড়ে না। সরকারী রিপোর্টে শুনেছি, অন্যূন একলক্ষ জননী পশ্চিম-বঙ্গে "লুপ" ধারণ করেছেন—কিন্তু "লুপের" একটা ছবিও সংবাদ-পত্রে চোখে পড়েনি। জন্মনিয়ন্ত্রণের সাফল্যের ওপর ভারতবর্ষের প্রগতি অনেকখানি নির্ভরশীল: নেতাদের এ-ধরনের বাণী সংবাদপত্রে সহজে দেখতে পাই। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রামে গ্রামে কি ভাবে চলছে, কতোটুকু চলছে তার বিবরণ কোথায়? অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে কি বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা লুকিয়ে নেই? বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতিনীতির এই অর্থপূর্ণ সংঘাত কি 'সংবাদ' নয়?

এমনি করে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। কিন্তু বলে লাভ কি? বড়ো বড়ো সংবাদপত্রগুলির মুনাফা নিশ্চিত; বিজ্ঞাপনের জন্মে লড়বার দরকার নেই, প্রচার বাড়াবার জন্মে প্রতিযোগিতা নেই। সুতরাং নতুন কিছু করবার গরজও নেই। এবং যেহেতু গরজের বালাই নেই, তাই আমাদের সংবাদপত্রে উদ্ভাবনশীলতার চিহ্ন দুষ্প্রাপ্য। অথচ একেবারে যে নেই তাই বা বলি কি করে? নতুন দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব নিউজপ্রিন্টের দুরবস্থা সত্ত্বেও অভিনব সংবাদ যে পরিবেশনে সক্ষম তার প্রমাণ দু-একখানা পত্রিকায় মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকি।

এখানে, এই প্রাচীন বারাণসীর সংলগ্ন নতুন রাজঘাট গ্রামের নতুনতর মহাশিক্ষণালয়ে একটি বঙ্গসন্তানের সঙ্গে পরিচয় হল।

বিশ্ববন্ধু চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক মনস্তত্ত্বে—সোস্যাল সাইকোলজি—পণ্ডিত। হাসি খুশি অমায়িক ভদ্রলোক। বাঙ্গালী বলেই হয়তো সাহিত্য পড়বার সুযোগ না পেলেও—(এখানে বাংলা বই কোথায় ?) অন্তরে রসপিপাসা প্রচ্ছন্ন। বলছিলেন, সারা ভারতবর্ষে এত সব নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছে, গ্রামে গ্রামে রেল বসছে, আসছে বিজলী আলো, গ্রামের মানুষ শহরে যাচ্ছে নতুন জীবনের সন্ধানে, চোখের পলকে গ্রাম হয়ে উঠছে শহর, যেখানে ছিল ঘনান্ধকার বনানী, সেখানে ফুটে উঠছে জনপদ, খরস্রোতা নদীর শক্তিকে বেধে নিয়ে আসছি আমরা মানুষের সেবায়, অথচ সাহিত্যে এর প্রতিফলন নেই কেন ? কেন বাংলা উপন্যাস এখনও শহুরে মানুষের গতানুগতিক জীবনযাত্রার মোহজাল ভেদ করে প্রসারিত হচ্ছে না জনপদে, গ্রামে, কারখানায়, ক্ষেত-খামারে ? কেন গোটা ভারতবর্ষ এসে পড়ছে না বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ?

জবাব দেওয়া সহজ নয় এ প্রশ্নের। সহজ কি ?

চৌকিদার চাই

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে আন্দোলন অনেক, আলোচনা খুব কম। তাই, কোনও সমস্যা নিয়ে, বিষয় নিয়ে, আলোচনা হ'তে দেখলে ভাল লাগে। সব যন্ত্রের মতো মস্তিষ্ক অ-বা-অল্প-ব্যবহারে অলস। আলোচনা যদি এদেশে বুদ্ধিমান ও ক্ষমতা-পুষ্ট মানুষের উদার প্রশ্রয় পেত, তা হলে গণতন্ত্রের শিকড় হ'ত জোরালো, ট্রাম-বাস-রেলগাড়ী পুড়ত কম, পুলিশের গুলিও চলত না এমন হামেশা।

আলোচনার আপসোস অনুপস্থিতি আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিকেই কেবল তরল, পঙ্কিল ও দুর্বল করেনি, করেছে সাহিত্যকেও। বাংলা-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয় না তা নয়—বৈঠকখানায়, রেস্তোরায়, শিক্ষায়তনে, পার্কে, ট্রামে-বাসে, এমনকি রাস্তায় ও রকে এখনও, এই ১৯৬৬ সালেও, বই নিয়ে বিতর্ক শোনা যায়। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনা প্রায় উঠে গেছে। 'পুস্তক-পরিচয়' শিরোপা ধারণ ক'রে যা মুদ্রিত হয়, তাতে বই নিয়ে আলোচনা কোথায়? সম্পাদক মশাই-রা হয়তো বলবেন, স্থানাভাব, এবং তাঁদের কৈফিয়ৎ একেবারে বাজে নয়। কিন্তু বই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে স্থানাভাব দুরপনেয় অন্তরায় হ'তে পারে না। সাহিত্য-পত্রিকা তো বাংলাদেশে কম নেই, কিন্তু একমাত্র 'চতুরঙ্গ' ছাড়া বই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কোথাও দেখতে পাইনে।

এ আলোচনার অভাব সাহিত্য-সৃষ্টিকে কিভাবে ব্যাহত করে তাও বোধকরি আমরা ভেবে দেখি না। বিজ্ঞাপনের যুগে বই-ও হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'কনজিউমার গুড্‌স্', বেচাবার জন্যে প্রকাশকরা

বেহিসেবী বেশাসন বেয়াকুফ্ প্রশংসা আবিষ্কার করেন, এবং, আপনারা হয়ত জানেন না, লেখকরা নিজেরাই বিজ্ঞাপনের প্রশস্তি তৈরি ক'রে দেন। তা না হয় হল। বই-এর প্রশস্তি লেখবার জন্যে স্বল্পবিত্ত প্রকাশক কেনই বা বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হবেন? আর, আপনি যদি একটা মোটা উপন্যাস লিখতে পারেন, তার বিজ্ঞাপনই বা কেন লিখতে পারবেন না? বিপদ আসে তখন, যখন আমি নিজের বই-এর প্রশংসা লিখে, বিজ্ঞাপনে তার নন্দনকান্তি চেহারা দেখে, তাকে সত্যি ব'লে বিশ্বাস ক'রে বসি। কঠিন কঠোর বিচারের অভাবে আমরা যে-যার-খুশি যা কিছু লিখে যাই, যতো বেশি পারি লিখি, এবং সস্তা প্রশংসায় আত্মাভিমানী হই। ফলে, আমাদের প্রত্যেকের রচনায় যে-সব দুর্বলতা থেকে যায় তা দূর হবার সুযোগ পায় না, কেন-না কেউ না কেউ সেগুলো দেখিয়ে দেয় না, দেখিয়ে দিলে আমাদের গোসা হয়, ভাবি লোকটার কিছু স্বার্থ আছে; আমরা অনেক সময় জানতে না বুঝতেও পারি না কোথায় আমাদের রচনা কমজোর, কেন এতো লিখেও আমরা সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে উঠতে পারি না। অথচ এজন্যে কোনও লেখকের একরাত্রির নিদ্রাও অযথা বিঘ্নিত হয় না।

এক্ষেত্রে পাঠকদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি। আপনি মাছের বাজারে গিয়ে পচা মাছ দেখলে চেঁচান, মুদি যদি মুসুরডালে পাথর মিশিয়ে দেয়, পরের দিন তাকে গালাগাল দিতে ছাড়েন না; অথচ পয়সা দিয়ে বই কিনে যদি তৃপ্তি না পান, লেখক, প্রকাশক বা পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে আপনার মন্তব্য জানাবার প্রয়োজন মনে করেন না। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক যদি পাঠকদের কাছ থেকে অনবরত চিঠি পান বিস্তৃত সাহিত্য-সমালোচনার দাবী জানিয়ে, তাহলে অবস্থা নিশ্চয় অন্যরকম হয়। আসলে, হয় পাঠকদের রুচি এমন তরল যে, যে-কোনও উপন্যাসই দিবা অথবা নৈশ নিদ্রার স্বাগত সহায়ক; নয়তো লেখকশ্রেণীর ও সম্পাদককুলের

প্রতি তাঁদের অনাস্থা এতো গভীর ও ব্যাপক যে আলোচনার ইচ্ছে পর্যন্ত হয় না। ঠিক যে-কারণে এ-দেশের গোয়ালা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দুধের নামে জল বিক্রি করে, সে-কারণে সাহিত্যের নামে আমরা অনর্গল আপনাদের নকল-সাহিত্য পরিবেশন করি। 'হায় লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে।'

এমন কিন্তু চিরদিন ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে বহুবছর নিষ্ঠুর কষাঘাত খেতে হ'য়েছে বিপক্ষ সাহিত্যিক শিবিরের হাতে; 'সবুজপত্র' বহুকাল সাহিত্যের উচ্চমান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উত্তর-তিরিশে 'পরিচয়' সাহিত্য-আলোচনায় নতুন দিগন্ত এনে দিয়েছিল। কল্লোলযুগের সাহিত্য নিরীক্ষা থেকে কোনওদিন বঞ্চিত হয় নি। 'শনিবারের চিঠি' দীর্ঘকাল যে-চৌকিদারী করেছে তারও মূল্য কম ছিল না। তারপর হঠাৎ, স্বাধীনতার পরে, এক দিকে যেমন উৎপাদন বাড়ল, অন্যদিকে তেমনি সমীক্ষার মৃত্যু হল। এ-যেন দেশব্যাপী আত্মসমালোচনার ব্যাপক অভাবের তির্যক প্রতিফলন। রাজনৈতিক নেতারা যেমন তারস্বরে বলেন, আমরা যা করছি, সবার উপরে তাহাই সত্য তাহার উপরে নাই, তেমনি বলি আমরা লেখকরা। আপনারা যেমন মাছের বাজারে অনুপায় ঔদাসীন্যে যা পান তাই নিয়ে ঘরে ফেরেন, বই-এর বাজারেও তেমনি। অতএব, আমাদের সাহিত্যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, 'ফোটে না ফুল, বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।'

একেবারেই যে ফুল ফোটে না, নির্ঝরিণী বয় না তা তো নয়। এ-ও বলতে পারেন, সব দেশে, সব কালেই, জলো-দুধ পচাই-মদ 'সাহিত্য' বেশি সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, এ নিয়ে নালিশ করবার মানে নেই। প্রতি দেশ বলতে তো আমরা বুঝি ইংলণ্ড ও আমেরিকা। দু'-দেশেই সর্বদা, আজও, সাহিত্য নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, মহৎ সাহিত্য নাই-বা হল পয়দা। আমাদের শক্তি কম, পুঁজি সামান্য, আবাদ অল্প; তাই অপচয়ের সীমারেখাও সংকীর্ণ

হওয়া দরকার। তা ছাড়া, নতুন এক্স্‌পেরিমেণ্ট যাঁরা করছেন, তাঁদের কলমে জোর আসবে কি করে যদি-না পাঠক সজাগ, সচেতন, সবাক চরিত্রে রঙ্গমঞ্চে সতত হাজির না থাকেন?

ক্বচিৎ কখনও এক-একখানা বই নিয়ে বাংলা পাঠক-সমাজ যখন উত্তেজিত হন, প্রবাসে আমার আনন্দ হয়। হোক না এ উত্তেজনা অনেকাংশে তরল, তবু নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যের মরুতে হঠাৎ যেন ওয়েসিস্‌ দেখতে পাই। এ কারণে সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে উত্তেজিত আলোচনায় আমি পুলকিত হয়েছিলাম। সমরেশ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর লেখার মাধ্যমে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সন্তোষ এখনও অনর্জিত। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত-বয়স্ক উপন্যাসের একান্ত অভাব; সমরেশ বসুর লেখায় সে অভাবপূরণের প্রচেষ্টা অনেক দিন থেকে দেখতে পাচ্ছি। কখনও বা তিনি সার্থক হয়েছেন, কখনও ব্যর্থ, কিন্তু সাহিত্য নিয়ে ন্যাকামি না করার জন্যে তিনি শ্রদ্ধেয়। আমাদের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত-বয়স্ক সাহিত্য রচনা সহজ নয়। অ্যাডল্ট লিটারেচরের বিরুদ্ধে রয়েছে আমাদের বহুবিধ সংস্কার, আমাদের ঢাক-ঢাক নীতিবোধ, চিরা-চরিত পথে চলবার সহজাত প্রচেষ্টা। কোমল, স্নিগ্ধ, মধুর, শোভন, আমাদের সভ্যতার অঙ্গসজ্জা। এ-কারণে আমরা ইমোসনের চেয়ে সেন্টিমেণ্ট পছন্দ করি, প্যাশনের চেয়ে ডিমায়ার, বিশ্লেষণের চেয়ে বিশেষণ; আমাদের চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকতা বেশি, আমরা ওয়াটসনের মত 'সি বাট নোটিশ নট'; যদি-বা দেখি, তখুনি বলি, যা ঘটে তা সব সত্যি নয়, আসল সত্যি হল—সত্য, শিব, সুন্দর। এই বাস্তব-উপেক্ষা যে কী গভীর ভাবে আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টিকে পঙ্গু করেছে তা নিয়ে বিচার-বিবেচনাও বড় আমরা একটা করি না।

ফলে, আমাদের সাহিত্যে কতগুলি 'ট্র্যাডিশন' আছে; নিতান্ত মধ্যবিত্ত নীতি-বোধ ও সেন্টিমেণ্টের 'ট্র্যাডিশন,' যা কাটিয়ে ওঠা

সহজ নয়। দেখতে পাবেন, স্ত্রী-চরিত্রের যে কাঠামো শরৎচন্দ্র তৈরী করে গেছেন, মোটামুটি তাই নানা বেশে, অঙ্গভূষণে আমাদের সাহিত্যে আজ পর্যন্ত চলে আসছে, এমন কি বিমল মিত্র ও 'শংকরে'র উপন্যাসেও। এ পথ সহজ বলে, আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-উপন্যাসের বলিষ্ঠ রোমান্টিক স্ত্রী-চরিত্রের (কুমুদিনী, লাবণ্য) প্রতিফলন বেশি হ'তে পারে নি। এর মধ্যে দৃপ্ত বিপরীত দিগ্‌দর্শন করেছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসে, আমার মতে, একমাত্র তিনিই, এখনও পর্যন্ত, বেশ কিছুটা প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্য-কৃতি রেখে গেছেন। কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসকৃতি বাধ্য হয়েই রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ; একে তো তিনি রাজনৈতিক দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হবার পর সাহিত্য তৈরী করতে পারেন নি, পরন্তু, তাঁর প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ উত্তরসূরীদের মধ্যে অনুভূত হয় নি।

এর মধ্যে সমরেশ বসু কিছুটা ব্যতিক্রম। এবং সমরেশ বসুর মধ্যে 'বিবর' আরও ব্যতিক্রম। কারণ, 'বিবর' বাংলা ভাষায় প্রথম 'অস্তিত্ববাদী' উপন্যাস-প্রচেষ্টা। 'অস্তিত্ববাদ' ব্যাপারটা দার্শনিক-ভাবে জটিল, এবং জার্মান-ফরাসী-মানস-জাত বলে, আমাদের কাছে, আরও। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় সাহিত্যে 'অস্তিত্ববাদের' অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। বছর দুই আগে অন্য এক লেখক একখানা উপন্যাসকে 'অস্তিত্ববাদী' আখ্যান দিয়েছিলেন; সেটা ছিল অপপ্রয়োগ। উপন্যাসের নাম 'দুপুর গড়িয়ে বিকেল', লেখক, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁর 'রাজধানী'তে অস্তিত্ববাদের সম্ভাবনা ছিল বেশি, বোধহয় তিনি টের পান নি। 'বিবর' অস্তিত্ববাদী এ-জন্যে যে এখানে একটি মানুষ একমাত্র তার নিজের কথাই বেপরোয়া সাহসে বলছে, কেন না মানুষ কেবল নিজের কথাই কিছুটা প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারে, বাকী যা সে বলে, তার অধিকাংশই নেকা। শুধু 'আমি' এবং আমার 'মুহূর্তগুলি'-ই সত্য,

আর সব আন্দাজ, বড় বড় বুলি, বলতে বলতে, শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে গেছে, তার কোনও মানেই নেই। কথাটা খুব সহজ করে বলা হল, পণ্ডিতদের কাছে মার্জনা চেয়ে।

'বিবরে' প্রচলিত নীতি-বোধ, শালীনতা, সত্য-শিব-সুন্দরকে ঝাঁটা মারার চেষ্টা আছে—এ-যুগে মনে-মনে, কথাবার্তায়, কাজে, আমরা যা সর্বদা মারছি, যদিও সাহিত্যে মারবার সাহস নেই। সমরেশ বসু এ সাহস দেখিয়েছেন, এ জন্যে অনেকের গালাগাল তাঁকে পেতে হয়েছে, এবং, বলতে দিন, বই তাঁর বাজারে কাটছেও বেশ। অথচ 'বিবর' পাকা উপন্যাস নয়, আঙ্গিক ও ভাষায় ত্রুটিপূর্ণ, ও—যা সবচেয়ে দুঃখের—পুরোপুরি ট্র্যাডিশন-বর্জিত নয়। 'বিবরে' আলবার্ট কাম্যুর প্রভাব সহজে লক্ষণীয়; পড়বার সময় মনে হয় কাম্যুর কিছু কিছু বাক্যের বা চিন্তনের বাংলা বিন্যাস করা হয়েছে; কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই। 'বিবর' 'দি ফল্' নয়, সমরেশ বসু কাম্যু নন। কাম্যুর উপন্যাসে একটি মানুষের নিষ্পাপ অপরাধ, একটা গোটা মানবসভ্যতার কাতর কনফেসন, মুক্তি-প্রার্থনা। 'বিবর' বড় জোর বাংলা ও ভারতীয় সমাজের একটি বখে-যাওয়া তরুণের পাপ থেকে পালাবার সংক্ষিপ্ত, ব্যর্থ প্রয়াস।

'বিবরে'র পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়; শুধু বলবো, পড়বার সময় সুখের সঙ্গে দুঃখও পেয়েছি কম নয়। দুঃখ এজন্যে যে সমরেশ বসু, আমার ধারণা, এ-ধরনের উপন্যাস রচনায় যে পরিমাণ নিষ্ঠা, সময় ও পরিশ্রম দরকার, তার সামান্যই দিয়েছেন বা দেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন। ফলে, উপন্যাস হিসেবে অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ হয়েও, 'বিবর' ব্যর্থ। কাম্যুর 'দি ফল্' সব মানুষের পতন; একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ—সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পৃথিবীর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ—একটা গোটা সভ্যতার নির্মোক সমীক্ষা সামান্য ক'টি পৃষ্ঠায় কি দারুণ আন্তরিকতায়, কি গভীর বেদনায়, কি বিস্ময়কর সংযমে পরিবেশিত। 'বিবরে'র 'আমি' বড় জোর এক

'বখা' ছোকরা, যার ভাষা নেই, বকুনি আছে, যার অনুভূতিতে প্রত্যয়ের অভাব, যার অস্তিত্ববাদ শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক ভালোবাসায় অপচিত, যার অপরাধ, অত দাপট সত্ত্বেও, নিষ্পাপ নয়—কাম্যুর 'দি আউটসাইডার'-এর শেষ পৃষ্ঠায় যে পাপ মুক্তির সন্ধান, 'বিবরে'র শেষাংশে তেমনি, পাপের বন্ধন। তাই 'বিবর' প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস নয়, যদিও হ'তে পারতো, যদি সমরেশ বসু আরও যত্ন নিয়ে লিখতেন, যদি উত্তমপুরুষের যোগ্য ভাষা লিখতে লিখতে এত বেশি হোঁচট না খেতেন, যদি প্রাপ্তবয়স্কের সংযম ও নীরবতা তাঁর উপন্যাসে আনতে পারতেন। 'বিবর' হয়েছে অ্যাডোলেসেন্ট উপন্যাস—মাঝে মাঝে চমৎকৃত হবার মতো অংশ সত্ত্বেও। এখানেই 'বিবরে'র ব্যর্থতা—যা আমাদের লেখকশ্রেণীর সামগ্রিক ব্যর্থতা—প্রায় কোনও কিছু আমরা সর্বাঙ্গ ক'রে উঠতে পারি না, হয় ক্ষমতার অভাবে, নয় নিষ্ঠার। 'বিবর' তাই, অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হয়েও হল না; অস্তিত্ববাদ আর যাই হোক অপরিণতবয়স্ক জীবনদর্শন নয়।

'বিবরে'র পথ ধ'রে আরও কেউ হয়তো অস্তিত্ববাদের গর্তে ঢোকবার চেষ্টা করবেন বাংলা-সাহিত্যে; ফল, সাহিত্যের দিক থেকে, ভালো হবে ভরসা পাই না।* আমার ধারণা—মিথ্যে হলে

* বিবরের পথ ধরে ১৩৬৬-৬৭ সালে বেশ কিছু বাংলা উপন্যাস-গল্প রচিত হয়েছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবাগত, সম্ভাবনাপূর্ণ, যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাস অনেকাংশে দুবল ও রসহীন। অস্তিত্ববাদের যৌন দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আমাদের একেবারে অনায়ত্ত। অস্তিত্ববাদ আর যাই হোক পর্ণোগ্রাফি নয়, অস্তিত্ববাদের যৌন দৃষ্টিভঙ্গী হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যানসারে' পরিস্ফুট দেখতে পাবেন। ছোট্ট একটি গল্পে দেখতে চান তো সার্ত্রের 'ইনটিমেসি' পড়ুন। এবার সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার ঘোষের 'অস্তিত্ববাদী' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিন; দেখবেন সমরেশ বসু যদি-বা sex-কে খানিকটা de-personalise করতে পেরেছেন, অন্যরা পারেন নি। 'দুপুর গড়িয়ে বিকেল' উপন্যাসে Existentialism হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Sexistentialism.

সুখী হবো—সমরেশ বসু নিজে আবার সহজে এ ধরনের উপন্যাস ধরবেন না; সুতরাং একটা সম্ভাবনাময় প্রযত্নের বোধহয় আপাতত এখানেই শেষ হল। বহুদিন কোনও বাংলা ঔপন্যাসিকের সুগঠিত সুপক্ক ঘনবদ্ধ স্থায়ী স্নাতকোত্তর পরিণতি দেখতে পাইনে। বেশির ভাগই নিজের পথের উচ্চাশা জাগিয়ে কিছু দূর পৌঁছে অলি-গলিতে সৃজনীশক্তির অপচয় করে বসে আছেন। কিছুদিন হল সমরেশ বসুর মধ্যেও যুগের এই দুর্লঙ্ঘনীয় অপচয় দেখা দিয়েছে।

কাম্যুর একটি বাক্য দিয়ে শেষ করিঃ উই আর মেকিং প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড ইয়েট নাথিং ইজ চেঞ্জিং। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু কিছুই তো বদলাচ্ছে না।

বুদ্ধিজীবী

এপ্রিল মাসে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 'মুখোমুখি' বেতার-ভাষণ আপনারা অনেকে শুনে থাকবেন, অথবা পত্রিকায় পাঠ করে থাকবেন। ভাষণের শেষ দিকে প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমঝোতা ও সহকর্মীতার সেতু-বন্ধন করতে চান। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন লেখক, কবি, শিল্পী ও সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদদের। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণে ক্ষেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে প্রশাসন ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, যে-ব্যবধানের ফল মন্দ হয়ে উঠেছে উভয় পক্ষেই। সুতরাং এ ব্যবধান দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টিশীল লেখক, শিল্পী, সমাজ-বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাবিদদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এবং···

প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন এখানে স্বভাবত মনে আসে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের দশ-বিশ-পঞ্চাশ জন লেখক, শিল্পী ইত্যাদি মানুষের কয়েক ঘণ্টা-ব্যাপী বৈঠকেই বর্তমান প্রশাসন-বুদ্ধিজীবী ব্যবধান সঙ্কুচিত হবে এমন কোনও ভরসা নেই। দ্বিতীয়ত, এ ব্যবধান দূর করতে হলে সমাজব্যবস্থার ও প্রশাসন ব্যবস্থার যে-আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন, তা ঘটাবার আগ্রহ ও সঙ্কল্প দিল্লী কিংবা রাজ্য-রাজধানীতে আছে বলে প্রমাণ নেই। তৃতীয়ত, সৃজনশীল লেখক বা বুদ্ধিজীবীগণ আমাদের সমাজে কি ধরনের ভূমিকায় সক্রিয় হলে সরকার এবং তাঁরা নিজেরাও সুখী হবেন, তৃপ্তি পাবেন তা নিয়ে পরিষ্কার কোনও ধারণা আছে বলে মনে হয় না।

রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনকার্যে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা দাবি করে থাকেন। চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার সময় আবেদন পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হয়েছিল যে লেখক, কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতকলাবিদগণ দলে দলে দেশ-প্রেম-সঞ্জীবক কর্মে এগিয়ে আসুন। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান বেতারে একই সময়ে একই ওয়েভলেংথে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা প্রসারিত হয়েছিল, দেশপ্রেমিক নাটক অভিনীত হয়েছিল। শান্তিকালেও রাজনৈতিক নেতারা বার বার দুঃখপ্রকাশ করেছেন এজন্যে যে আমাদের দেশের সাহিত্যে, শিল্পে ভাকড়া-নাঙ্গাল, ভিলাই-রাউরকেল্লা-দুর্গাপুর, নাইভেলি-এইচ্-এম্-টি-ট্রম্বে-জাওলামুখীর যথেষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। জবাহরলাল নেহরুও এ জন্যে একাধিকবার ক্ষেদ প্রকাশ করেছেন, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মুখেও শুনেছি সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের দেশ-বিকাশ-সমুজ্জ্বল সাহিত্য রচনা করবার আহ্বান।

কথা ও বক্তৃতার ওপর যখন এখনও ট্যাক্স বসে নি, রাজনৈতিক নেতাদের যখন অনর্গল বক্তৃতা করতে হয়, এবং তাঁদের কেউ যখন ভারতবর্ষে কাব্য বা উপন্যাস বা শিল্পচর্চা করেন না, তখন এ ধরনের দাবি অস্বাভাবিক নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়। চার্চিল সাহেব ছবি আঁকতেন, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন; তাই বোধকরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো সংকটকালেও তিনি ব্রিটেনের ঔপন্যাসিক-কবি-শিল্পীদের ওপর এই ধরনের দাবি জারি করেননি।

ভারতবর্ষের অবস্থা অবশ্য জটিল। একদিকে আমরা গণতন্ত্র, সুতরাং দ্বিমত, অন্যমত পোষণ করা এবং তা ব্যক্ত করার অধিকার এদেশের সংবিধানে স্বীকৃত। আমাদের সংবাদপত্রসমূহ 'স্বাধীন', আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পী 'স্বাধীন'। সরকারের গুণগান করবার বাধ্যবাধকতা থেকে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁরা মুক্ত। শুধু তাই নয়,

আমাদের সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর। ভারতবর্ষে এমন একজনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পী নেই যিনি নিজের ইচ্ছায় বা গরজে গঠনশীল সমাজের ছবি এঁকে তৃপ্তি পান, বা তৃপ্তি দেন। আমাদের শিল্পীগণ বর্তমানে abstraction-এর সীমাহীন গগনে বিচরণ করছেন, এবং ভাস্করগণও একই পথে পা বাড়িয়েছেন। সাহিত্যে বড় বড় প্রজেক্টগুলির ছায়া পড়েনি বললেই হয়। এমন কোন কবি কি আছেন যিনি নতুন ভারতবর্ষের শঙ্খ বাজিয়ে পাঠকদের চিত্তে স্বদেশপ্রেমিক হিল্লোল জাগিয়েছেন? স্বাধীন ভারতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ-ভারতীর জন্ম হয়নি এখনও; নতুন বন্দেমাতরম্ রচিত হয়নি; দ্বিতীয়বার 'গোরা' বা 'আনন্দমঠের' মত উপন্যাস রচিত হয়নি। চীনের বিরুদ্ধেই বলুন, বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই বলুন, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকালে যে বিরাট গণ-জাগরণ ঘটেছিল, তার প্রতিচ্ছবিও আমাদের সাহিত্যে বা শিল্পে এখনও ধরা পড়েনি।

এ অবস্থাকে বলা যেতে পারে বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে সৃষ্টিশীল ভারতবাসীর নন-ইন্‌ভল্‌ব্‌মেণ্ট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্-এর লেখক নয়পাল তাঁর 'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেসে' আক্ষেপ করে লিখেছেন, ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা দেশ নিয়ে যথেষ্ট ইন্‌ভল্‌ব্‌ড্ নন, তাঁরা 'নিরপেক্ষ'; তাঁরা মুখে প্রায় সবকিছুরই নিন্দা ও সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু তাও ভাসা ভাসা, কেন না কোনও কিছুর পক্ষে একদিকে যেমন তাঁদের আন্তরিক সমর্থন নেই, অন্যদিকে নিষ্ঠাবান প্রতিবাদও নেই। দেশটা যেন তাঁদের নয়, যেন তাঁরা বাইরের দর্শক মাত্র, যেন মৌলিক নিন্দা বা সমালোচনা করেই তাঁদের কর্তব্যের অবসান, প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নেবার দায়িত্ব যেন তাঁদের নয়, এ-জন্যে যে দাম দিতে হয় তার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত নন। বেশির ভাগ বিদেশী বুদ্ধিজীবীদেরই আমাদের সম্বন্ধে বর্তমানে এই ধারণা।

তাহলে, একদিকে রয়েছে সরকারী নেতাদের নালিশ যে বুদ্ধি-জীবীরা সন্তোষজনক পরিমাণে গড়ে-ওঠা ভারতবর্ষের ওপর দৃষ্টিপাত করছেন না ; অন্যদিকে, অন্য-নালিশ যে চতুর্দিকে অসহনীয় অবস্থা দেখতে পেয়েও বুদ্ধিজীবীগণ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না।

অবস্থাটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

আঠারো বছর আগে, দেশ যখন স্বাধীন হল, অধিকাংশ লেখক, কবি ও শিল্পী নতুন নির্মাণবীর নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন, সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে দাবি উঠল, মানুষ যেহেতু রুটি-কিংবা ভাত খেয়েই বাঁচতে পারে না (যদিও না খেয়ে এদেশে মরতে পারে), সেহেতু সরকারকে সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত-নাটক সবকিছু প্রসারণের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব নিতে হবে। পুরাতন রাজন্য-জমিদার-সমাজ উৎসাদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-নৃত্য-চারুকলা-শিল্পীদের যে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হল, তার আপনোদনের দায়িত্বও তাঁরা সরকারকে গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন। ফলে, সরকার সাহিত্য-সঙ্গীত-কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন ; গড়ে উঠল সাহিত্য-ললিতকলা-সঙ্গীত-নাটক আকাদমি ; স্থাপিত হল নানাবিধ পদবী-পুরস্কার। অথচ এত সব করেও সরকার বুদ্ধিজীবীর মন পেলেন না। আকাদমি-গুলির পনেরো বছরের ইতিহাস দীনদরিদ্র : বর্তমানে কোনওমতে বেঁচে থাকা ছাড়া বড় কিছু ওঁদের কাজ নেই। বছরের 'শ্রেষ্ঠ' কিতাব লিখে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়ে কোনও সাহিত্যি-কের মন ভরে না—দাক্ষিণ্যের এমন দীনতা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। শ্রেষ্ঠ ছায়াছবির তুলনায় এ পুরস্কারের যৎসামান্যতার সরকারী ব্যাখ্যা হল ঃ প্রতিটি ভাষায় পুরস্কার দিতে গেলে সংক্ষিপ্ত তহবিলে এর চেয়ে বেশি বরাদ্দ অসম্ভব। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের কলঙ্ক বছরের 'শ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিকই বা হজম করেন কি

করে ? তেমনি আকাশবাণীর মারফৎ অন্যূন দশ হাজার মসিজীবীর সহযোগিতা সরকার পেয়ে থাকেন, কিন্তু এ সহযোগিতায় প্রাণের স্পন্দন নেই, মর্মের বন্ধন নেই, এক-লক্ষ্য-এক-পথ সহকর্মিতা এ নয়। মসিজীবীর লাভ কিঞ্চিৎ উপরি রোজগার, এ বাজারে সর্বদা স্বাগত। অর্থের আদান প্রদান সরকার ও মসিজীবীদের মধ্যে যতো বাড়ছে, মনের আদান-প্রদান যাচ্ছে ততো শুকিয়ে।

আমাদের প্রশাসন যন্ত্রে ব্যুরোক্রাটের দাপট এতো বেশি, উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত, যে এখানে অন্য কারুর পাত পড়ে বারান্দায়, অপাংক্তেয়দের সঙ্গে। অথচ পনেরো বছরের পরিকল্পনাপথে অগ্রগতিতে দেশটার আসল রূপ গেছে বদলে, যান্ত্রিক সভ্যতার ভিৎ গড়ে উঠেছে, যেখানে ব্যুরোক্রাটের দাপট পৌঁছতে গেলে সমাজের দম বন্ধ না হয়ে উপায় নেই। প্রশাসনের যে-কোনও বিভাগে দেখতে পাবেন, যাঁরা একস্‌পার্ট এবং প্রফেশন্যাল, তাঁদের মাথার ওপর বসে আছেন অন্তত তিন ধাপে অর্ধমূর্খ, অতি-চালাক (কখনও সখনও ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) রাজনৈতিক অথবা ব্যুরোক্রাট ; এই তিন ধাপের পাথর-চাপায় একস্‌পার্ট ও প্রফেসনালের শ্বাস রুদ্ধ। এনজিনীয়র বলুন, বৈজ্ঞানিক বলুন, শিক্ষাবিদ বলুন, সবাকার স্থান ব্যুরোক্রাটদের অনেক নীচে ; এতে যে তাঁদের অবমাননা তাই নয়, নিজেদের মতামত উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছবার পথে এতো রকম বাধা, এতো বেশি অজ্ঞতার এতো দুরন্ত উপদ্রব যে, এমন পারদর্শী কমই আছেন, সরকারী সংস্থাগুলির সতত-প্রসারমান বিবরে, যাঁদের অন্তর সার্থকতার আলোয় উজ্জ্বল, যাঁরা অনুভব করে কর্মের সাফল্য, ফলপ্রসূ জীবনের উদ্দীপক আনন্দ।

অথচ এ পরিস্থিতির জন্যে সরকারকে দোষ দিয়ে ক্লীব আত্মসুখ ছাড়া আর কিছু লাভ নেই। গণতন্ত্রের সঞ্জীবন-শক্তি কর্মের, চিন্তার ও বচন-লিখনের স্বাধীনতা থেকে আসে। ডিক্টেটরসিপে রাজনৈতিক ক্ষমতা সার্বভৌম রূপ গ্রহণ করে, বুদ্ধিজীবী, মসিজীবী,

শিল্পীদের প্রদর্শিত পথে না চলে উপায় থাকে না। ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরকম। আমরা পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র'; কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় নির্জীব, নীরব, নিষ্প্রাণ, উদাসীন। যে পথে গেলে বিপদের সম্ভাবনা সব চেয়ে কম, কর্তাব্যক্তিদের চটবার সম্ভবনা ক্ষীণতম, সে পথ আমাদের কাম্য।

আপনি হয়তো প্রতিবাদ করে বলবেন, এই তো পশ্চিমবঙ্গে এখনও মাস্টারমশাইরা সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রতিবাদ, সৎসাহস,সরবতা আমি উপেক্ষা করছি কেন?

উপেক্ষা করছি না। প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাস্টারমশাইরা নিজেদের মাইনে, মাগ্‌গীভাতা ইত্যাদি বাড়াবার জন্যে সংগ্রাম করছেন, ভালোই। আপনাদের মতো আমিও চাই, সংগ্রাম তাঁদের সার্থক হোক। কিন্তু এ সংগ্রাম, এ প্রতিবাদ, তাঁদের স্বার্থের জন্যে।

এখানে মুখ্য প্রেরণা উদরের অথবা অন্তরের। মস্তিষ্কের প্রেরণা কতোখানি?

শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা ছাত্রস্বার্থের প্রসারণে মাস্টারমশাইদের বিশেষ আন্দোলিত হতে দেখি নে। নিজেদের স্বার্থে তারা ছাত্রদের পরীক্ষার সময় পরিদর্শক হতে অস্বীকার করতে চান, করুন। কিন্তু ছাত্রদের পড়াশোনার ক্রম-অবনতি, এবং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার হাজার রকমের দুর্বলতা দূর করবার জন্যে তাঁদের অবদান কোথায়? সরকারী টেক্‌স্‌ট বই নিয়ে যখন কালোবাজার হয়, তখন মাস্টারমশাইরা চুপ করে থাকেন কেন?

এমন এককাল ছিল যখন বুদ্ধিজীবীরা ভারতবর্ষের সমাজেও অন্যায়ের প্রতিবাদে ভীত হতেন না, যখন ভিন্নমত প্রকাশে তাঁদের অন্তর কেঁপে উঠত না। উনিশশো একুশে মহাত্মা গান্ধীর অসহ-যোগ আন্দোলনের কোনও কোনও রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি; এবং তার বিরুদ্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা

বোধ করেন নি। মেজরিটির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চলবার যে দারুণ পিপাসা বর্তমান কালে বুদ্ধিজীবীদের পেয়ে বসেছে, প্রতিবাদের দায়িত্ব আজ যে-ভাবে অবলুপ্ত, কোনও কিছু অন্যায় জেনেও, একমাত্র তা ক্ষমতা-পুষ্ট বলে তাকে মেনে নেবার যে ব্যাপক আত্মসমর্পণ চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়, স্বাধীন ভারতবর্ষের দুর্বলতার বোধকরি এই হল সবচেয় বড়ো উৎস। আজ আর কেউ একলা চলতে চাই নে আমরা; আমাদের মধ্যে মিনরিটি-অব-ওয়ান আজ দুষ্প্রাপ্য। সবার রং-এ রং মেশাতে মেশাতে আমরা বুদ্ধিজীবীরা একেবারে বেরং হয়ে গেছি।

ফলে এমন এক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে যেখানে দ্বিমত, অন্যমত মানেই দেশদ্রোহিতা। চীন-ভারত আক্রমণের পরে 'দেশ' পত্রিকায় বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর লেখক-কবি-শিল্পীগণ যে আর্ত নিনাদে এককণ্ঠে এক ভাবায় দেশপ্রেমের প্রমাণ জারি করবার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার বিপজ্জনক দিকটা কি আমরা ভেবে দেখেছিলাম? দেশপ্রেম অত্যন্ত মূল্যবান, এবং চীনা-আক্রমণ বর্তমান যুগের ইতিহাসে অন্যতম গর্হিততম ঘটনা। কিন্তু 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় বাংলার সাহিত্যিকরা সেদিন যে-ধরনের দেশপ্রেমের মহড়া দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষেও তা করতে কোনওদিন রাজী হন নি। শুধু তাই নয়। সত্যজিৎ রায় সে 'দেশপ্রেমিক' ঐকতানে কণ্ঠ মেলান নি বলে তাঁর স্বদেশপ্রীতির প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত করা হয়েছিল। বাংলা দেশের লেখকরা চীন সম্পর্কিত বই প্রকাশ্যে জ্বালিয়েছিলেন, কিংবা তার বিক্রী বন্ধ করে দিয়েছিলেন।* এই ধরণের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা

---

* হালে এসব বই আবার বাজরে বার হ'তে শুরু করেছে। এক বিজ্ঞাপনে দেখলাম, পাঠক চাহিদার জন্যে। যে-"পাঠকরা" মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' ১৯৬৩ সালে ভস্মসাৎ করতে চেয়েছিল আজ কি তারাই তার পুনঃ প্রকাশ দাবী করছে? না-কি মনোজবাবু নিজেই বুঝতে

লেখক ও শিল্পীদের মানসিক স্থৈর্য প্রমাণ করে না ; তারাও যদি রাজনৈতিক কলরবের খানিক অন্যপ্রান্তে না দাঁড়ান, তাহলে দেশবাসীকে বুদ্ধি দিয়ে সমস্যা-বিচার শেখাবে কে ? আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক, জর্জ কেনান বলেছেন, গণতন্ত্র যখন আত্মপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে ডিক্টেটরসিপকেও ছাড়িয়ে যায়। এই জর্জ কেনানই বলেছেন, এবং নজির দিয়ে প্রমাণ করেছেন, যে কোনও দেশই কোনও দেশের পুরোপুরি মিত্র নয়, পুরোপুরি শত্রুও নয়। ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে দেখা যায়, আজ যে শত্রু, কাল সে মিত্র ; দেখা যায়, পরম শত্রুতার মধ্যেও কিছুটা মিত্রতা বর্তমান, আবার পরম মিত্রও কোনও কোনও ক্ষেত্রে শত্রুর মত আচরণ করছে। ভারতবর্ষের কূটনীতির প্রধান দুর্বলতা (যেমন আমেরিকার বহুদিন ছিল), আমরা একসঙ্গে একটার বেশি দুটো দিক দেখতে পাই নে ; তাই একদিন হিন্দী-চীনী-ভাই-ভাই করে যেমন দুহাত তুলে নেচেছিলাম, আজ আমরা তার বিপরীত প্রান্তে চলে গেছি। এখানেও আসল অসাফল্য আমাদের বুদ্ধিজীবীদের। তারা হুজুগে মেতে ওঠেন, বহুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কথা বলেন, অন্য-মত, দ্বি-মত প্রচারে ভয় পান।

বর্তমানে ইণ্ডো-আমেরিকান ফাউণ্ডেসন নিয়ে বেশ একটা বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কের যে-অংশ রাজনৈতিক, তা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো শিক্ষামূলক ! এই ফাউণ্ডেসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর ফলাফল কি হবে এই তো হল আসল কথা ! এবং এ বিতর্কে শিক্ষাবিদদেরই তো এগিয়ে আসা উচিত। অথচ, এই প্রবন্ধ লেখবার সময় পর্যন্ত, একমাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন

পেরেছেন পাঠকদের মন বদলেছে, পুরাতন ঘৃণা আর নেই ? রাজনৈতিক কারণে বই পোড়ান এখনও বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে দুর্ঘটিত হয় নি ; রাজনৈতিক কারণে লেখক কর্তৃক বই অপসরণ, আশা করি, আর হবে না।

শিক্ষক ছাড়া (যাঁদের মধ্যে কয়েকজন কৃতী বাঙালী আছেন) ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনও সাড়া দেখতে পাই নে কেন? আমার নিজের মনে ফাউণ্ডেসন নিয়ে একদিকে আশা, অন্যদিকে সংশয়—আমি এর ভাল দিকটাও দেখতে পাচ্ছি, আবার কুফলগুলিও আন্দাজ করতে পারছি। মনস্থির করতে হলে শিক্ষাবিদরা কি বলেন আমার মত আরোও অনেকের জানা দরকার। ফাউণ্ডেসনের ভাল মন্দ খোলাখুলি বিতর্কিত না হলে গণতন্ত্রের দেশের লোক সব ব্যাপারটা বুঝবে কি করে? সারা ভারতবর্ষে অসংখ্য ব্যাপার নিয়ে কলরবের অন্ত নেই, কিন্তু দিল্লীর বাইরে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এত বড় একটা ঘটনায় উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। সম্প্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রখ্যাত প্রবীন অধ্যাপক বলছিলেন, 'আমাদের কথা বাদ দিন। উই আর ডেড।'

কলকাতার শিক্ষাবিদগণও কি তাই বলবেন?

এবারকার বক্তব্য বুঝি অগোছাল হয়ে গেল, তাই, পরিশেষে একটু গুছিয়ে নি। সরকার চান বুদ্ধিজীবী-মসিজীবীগণ এগিয়ে এসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে হাত মেলান। অথচ কি করলে এই হাত মেলানো সম্ভব তা সরকার যদি বা জানেন (জানেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে), ব্যবস্থা করতে তৈরি নন। কার্যত সরকারী নীতি হল বুদ্ধিজীবীদের মুখ বন্ধ রাখা। এ কাজ করার কলাকৌশল সরকার জানেন, তার ব্যবহারে কার্পণ্য করেন না। অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নিদারুণ ঔদাসীন্য, অথবা নিষ্ক্রিয়তা। চিন্তাশীল ভারতবাসী নিজের স্বাতন্ত্র্য আজ প্রায় হারাতে বসেছে। একদিকে স্বদেশপ্রেমের নামে এক ধরনের সাময়িক উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে গোষ্ঠী-স্বার্থের খাতিরে আঞ্চলিক আন্দোলন। এর বাইরে বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রকাশ ক্ষীণ, দুর্বল, দ্বিধা-গ্রস্ত। আজও, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-উৎসব মন্ত্রীদের পদধূলি না পেলে অসার্থক,

খবরের কাগজে তার রিপোর্ট ছাপা হবার সম্ভাবনা কম। আমরা রাজনৈতিক নেতাদের ও সরকারকে দোষ দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, কিন্তু দোষ আসলে আমাদের। দাসখৎ লিখে দেবার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার হল, স্বাধীনতার অ-ব্যবহার; অ-ব্যবহার থেকে পথ তৈরি হয় অপ-ব্যবহারের। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রসারণ আমাদের কাছে আজ এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর বাইরেও যে বুদ্ধিজীবী সমাজের কোনও বৃহত্তর মহত্তর কর্তব্য আছে, তা আমরা যেন ভুলে গেছি। আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এবং কিছুর জন্যেই আমরা আর দাম দিতে রাজী নই।

এ অবস্থার প্রতিফলন সাহিত্যে কি দাঁড়িয়েছে একটু নজর করলেই দেখতে পাবেন। আজকার বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিবাদ প্রায় উঠে গেছে। যে-প্রতিবাদ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল—ভিন্ন রূপে, বিভিন্ন শৈলীতে সমৃদ্ধ—যে প্রতিবাদ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে, বীরবলের প্রবন্ধে, এমনকি, উত্তরকালে, কল্লোলযুগের সাহিত্যেও, তার চিহ্ন আজ স্তিমিত। তাই, ঐতিহাসিক রোমান্স আমাদের উপন্যাসে এমন দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। তাই, আমাদের উপন্যাসের অবয়ব বাড়ছে, প্রাণশক্তি আসছে কমে। প্রতিবাদ নেই—না সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, না রাজনৈতিক, না ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মূল্যবোধের। এককালে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই একধরনের ঝলকানো সাহিত্য রচিত হয়েছিল। বর্তমানকালে এমন কোনও সাহিত্য-সম্রাট পর্যন্ত নেই যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। প্রতিবাদের অভাবে আমাদের সাহিত্য একেবারে নির্বিবাদ হতে বসেছে। নির্বিবাদ সাহিত্যে জীবনজ্বালা থাকে না। সে মৃত।

বই কৈ?

বই কারা পড়েন, কেন পড়েন, কি পড়েন, কি ভাবে পড়েন, কখন পড়েন? এ নিয়ে য়ুরোপ আমেরিকায় অনুসন্ধান চলছে বহু বছর ধরে; আমাদের দেশে শুরু পর্যন্ত হয়নি। সারা দুনিয়া ছড়িয়ে এসেছে জনতা-সংস্কৃতি, মাস্ কালচারের যুগ; আমাদের দেশে, শতকরা ত্রিশ-জন-অক্ষরজ্ঞানী নিয়ে, সে যুগ এখনও অনাগত। তথাপি দুয়ারে তার মৃদু আঘাত শোনা যাচ্ছে। আগামী পনের কুড়ি বছরে, এ দেশেও, নিরক্ষরতা অনেকখানি দূরীভূত হবে, বই-এর চাহিদা বাড়বে অনেক। বর্তমানে বিজ্ঞান ও টেকনলজির দিকে আমাদের যুবক সমাজ অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছেন, এও যুগের দাবী, তথাপি, আর্টস ও হিউমানিটিস্-এ, অর্থাৎ কলা-দর্শন-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে বেশ একটি বড় বাহিনী তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি প্ল্যানিং কমিশনের পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'য় শ্রীকমলেশ রায় ও শ্রী জে. পি. মিট্টল একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে জানা যায়, ভারতবর্ষে বর্তমানে দশ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট আছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা এম. এ. পাশ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা দু লক্ষ বিশ হাজার। আমাদের দেশে আরও আছেন, চার হাজার পি-এইচ. ডি.; এক লক্ষ সত্তর হাজার বি. কম.; বাইশ হাজার এম. কম.; দেড় লক্ষ এল-এল. বি.; এক হাজার এল-এল. এম.; দু লক্ষ বি. এড. অথবা বি. টি.; এবং ছ হাজার এম. এড.। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও টেকনলজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সংখ্যা বেড়েছে ৩·৮ গুণ; আর্টস অ্যাণ্ড হিউম্যানিটিস-এ ৪·২ গুণ।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে এখন অন্যূন এক কোটি।

সুতরাং, দেখতে পাচ্ছেন, শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে একেবারে মন্দ-গতি নয়। বস্তুত পক্ষে, একমাত্র চীন ছাড়া, নতুন গঠনশীল দুনিয়ায় শিক্ষাপ্রসারে আমাদের স্থান এখন প্রথম। শতকরা অক্ষরজ্ঞানীর সংখ্যায় নয়—এক্ষেত্রে আমরা এখনও মাঝামাঝি আসনে বসে আছি—শিক্ষিত মানুষের পুরো সংখ্যায়।

শিক্ষার প্রসার মানে বইএর প্রসার। এবং বই তো কেবল স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক নয়। বই মানে মনের খোরাক, অবসর যাপনের আনন্দ, বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনাকে উজিয়ে দেবার বস্তু। এক দিকে যেমন বিদ্যায়তনের পাঠ্য বইএর দাবী হু হু করে বাড়ছে, অন্যদিকে চাহিদা বাড়ছে সাহিত্যের। চাহিদা বাড়ছে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায়। কোনও কোনও ভাষায় বেশি, অন্য ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম।

যাকে আমি আমাদের দেশে পঠন-ও-লিখনের এক বিরাট ক্রাইসিস্ বলে মনে করি এবার সে প্রসঙ্গের অবতারণা করি। এক কথায় বলতে গেলে, আমরা ভারতবর্ষের লেখকরা, গণ-সংস্কৃতির দাবী মেটাতে পারছি না; এমন কি, এ দাবীর চেহারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় পর্যন্ত আমাদের নেই; আমরা জানিও না আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠক কি চান, কি-রকম তাঁদের মন, কি ভাবে আমরা তাঁদের সঙ্গে গভীর, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

বইএর দাবী একদিকে যেমন বাড়ছে, এবং বাড়বে, অন্যদিকে —এও আমরা বড় একটা ভেবে দেখি না—বই-পড়ার নানা রকম প্রতিবন্ধকও আমাদের সমাজে তৈরি হচ্ছে, আরও হবে। বই বলতে এখন ধরছি গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা-সমালোচনা-প্রবন্ধ-দর্শন ইত্যাদি। অন্যতম প্রতিবন্ধক আমাদের জীবনযাত্রায় ভাল-

করে-বেঁচে-থাকার নতুন আমদানী সম্ভোগ-বেগ। যান্ত্রিক সভ্যতা আনছে এই নতুন গতি আমাদের জীবনে, আমরা সেই প্রাচীন অলস অবসর স্বেচ্ছায়, অথবা দায়ে পড়ে, ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং, আমাদের মধ্যে এমন মানুষ বিরল নয় যাদের কাছে শুনতে পাবেন, 'বই পড়া? পড়তে তো চাই! কিন্তু একেবারে সময় করে উঠতে পারি নে।' এ ক্ষেদ মিথ্যে নয়।

এক কারণ হয়তো আমাদের অগোছাল জীবন, এবং এমন অনেক কিছু কুৎসিত দাবী আমাদের সময়ের ওপর, যা না মিটিয়ে উপায় নেই। আরও অনেক কারণ আছে: এ দেশের সাব-ট্রপিকাল আবহাওয়া, যা অতি সহজে আমাদের ক্লান্ত করে; বাসগৃহে স্থানাভাব; রাত্রিতে আলো জ্বেলে পড়লে স্ত্রীর সঙ্গে অনিবার্য কলহ; বই পড়া যে একটা আকর্ষণীয় আনন্দ, অনেক কম খরচের আনন্দ, অনেক পরিপূর্ণ আনন্দ, এই উপলব্ধির অভাব।

অন্তরায় আরও আছে। রেডিয়ো। আকাশবাণী ভাগ্যক্রমে এখনও আমাদের মন ও বুদ্ধিকে বড় একটা আকর্ষণ করে না, তাই অনেকে রেডিয়ো না শুনে বই পড়াতে আনন্দ বেশি পান। কিন্তু রেডিয়ো যে বই-পড়া কমিয়ে দেয় এটা প্রমাণিত সত্য। তেমনি, সিনেমা। এবং এর পরে আসছে টেলিভিশন। টেলি-ভিশন জোর দমে চালু হবার পর, অর্থাৎ আগামী পনের কুড়ি বছরে, আজ যারা সন্ধ্যা থেকে বেশি রাত্রি পর্যন্ত সময়ের কিছুটা বই পড়েন, তাঁদের অনেকে বই বন্ধ রেখে, দৃশ্য উপভোগে দৃষ্টি-ও-মনোনিবেশ করবেন, অনিবার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-সব দেশে গণ-সংস্কৃতি দানা বেঁধেছে, গণ-সংযোগ, মাস কমিউনিকেশন, শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছেছে, যেমন আমেরিকা, সেখানে তো বইএর দাবীও বেড়েছে শতগুণ। আমাদের দেশেই বা তা হবে না কেন?

হবে না, এমন কঠিন কথা আমি বলছি না। কিন্তু হবার আগে আরও অনেক কিছু হতে হবে। যা আমরা আজ ভেবে পর্যন্ত দেখছি না।

শুনতে যতই খারাপ লাগুক, বই হল কনজিউমার গুডস্। যে পঞ্জাবিনীর গল্প শুনে আমরা অনেকে হাসি, তাঁকে ঠিক দোষ দিলে চলে না। গল্পটা হল: এক পঞ্জাবী রমণী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস্-এ বাজার করতে গেছেন। বিত্তবতী, কোনও কিছুর অভাব নেই তাঁর। দোকনীরা যা তাঁকে দেখাচ্ছে, তিনি বলছেন, এ তো আমার আছে। ঘুরে ঘুরে গেলেন বই-বিভাগে। দোকানী কিছু নতুন বই দেখাতে, পঞ্জাবিনী বললেন, কিতাব? এ-ও আমাদের একখানা আছে।

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

বই-না-পড়ার যে-সব অনুকূল ঘটনা আমাদের জীবনে ধীরে আস্তে জমে উঠেছে, তা চূর্ণ করে, বই-পড়ার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে যে ধরনের উদ্যোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অধ্যবসায় ও দুঃসাহস দরকার, তার চিহ্ন আজ অনুপস্থিত। এ বিপদ-সচেতনতা না আছে লেখকদের, না প্রকাশকদের।

এবার বাংলা বই-বাজারের উদাহরণ দি; বিষয়টা সহজ-বোধ্য হবে।

আমরা অহংকার করে বলি, ভারতবর্ষে বাঙালী যতটা বই কেনে এবং পড়ে, আর কেউ তা করে না। আমাদের অনেক অহংকারের মত, এটাও মিথ্যে। বই কেনা এবং পড়ায় কেরল বাংলার অনেক আগে। ভারতের মানচিত্রে আমাদের স্থান দ্বিতীয়। এটাও অবশ্য কম কথা নয়। লোকসংখ্যা, গড়পড়তা রোজগার এবং শিক্ষার হার বিচার করলে বাঙালী পৃথিবীর প্রধান বই-পড়ুয়া সমাজগুলির অন্যতম।

অথচ, ভেবে দেখুন, কি দারুণ দরিদ্র আমাদের সাহিত্য-শিল্প!

একমাত্র উপন্যাস ছাড়া সৃষ্টিশীল সাহিত্য আমরা না লিখি, না ছাপি, না পড়ি। এবং আমাদের উপন্যাসও এমন গতানুগতিক যে তাতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন দিগন্ত-সন্ধান, নতুন দুঃসাহস, বিদ্রোহ, আন্দোলন—নিতান্ত সীমিত।

ভেবে দেখুন, আমাদের সাহিত্যে আজও, এই ১৯৬৬ সালেও, নাটক স্বীকৃতি পেল না। ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই শতাধিক বৎসর যাবৎ একাধিক স্থায়ী নাট্যশালা বিরাজমান। একমাত্র কলকাতাতেই নাটক-প্রেমিক সমাজ এমন ব্যাপক যাতে তিন চারটি স্থায়ী এবং বহু অ্যামেচার নাট্যশালা বা সংস্থা একসঙ্গে বিরাজ করতে পারে। নীলদর্পণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কম নাটক বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। একমাত্র বাংলাদেশেই শ্রেষ্ঠ কবিগণ—মাইকেল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ—নাটক বা গীতিনাট্য রচনা করেছেন। বাংলার নাট্যশিল্প ভারতবর্ষে সম্মানিত। অথচ আমরা নাটক পড়ি না, পড়ে আনন্দ পাই না, প্রকাশকরা নাটক ছাপতে চান না। প্রথম শ্রেণীর লেখকরা নাটক লিখতে চান না, লেখার গরজ বোধ করেন না। এখনও আমাদের ধারণা, নাটক শুধু নাট্যশালার জন্য। নাটক পড়বার জন্যে নয়।

ভেবে দেখুন, আমাদের সাহিত্যে সাটায়ার উঠে গেছে—এককালে যা ছিল বলিষ্ঠ, বীরবলের সময়, এবং পরেও। লেখককুলের মন এখনও এমন দুরারোগ্য রোমান্টিক, আমাদের তথাকথিত বৈদগ্ধ এমন জ্বালাহীন, আমাদের অনুভূতি এমন তরল, যে সাটায়ার আমাদের হাত দিয়ে তৈরি হয় না। যে ঐতিহ্য পরশুরাম সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁর সঙ্গেই হয়েছে তার সমাপ্তি। যা মধুসূদন এবং বীরবল পারতেন, সে ক্ষমতা বর্তমান সাহিত্য মহারথীদের মধ্যে অনুপস্থিত। আজ 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ'র ব্যঙ্গ-রস, অনেক সময় কষ্টকল্পিত এবং জার্নালিজম-মাফিক হাল্কা

হলেও, মাঝে মাঝে সত্যিকার উপভোগ্য ; কিন্তু যে-সাহিত্য-রথী 'সুনন্দ' ছদ্মনামে সুখ্যাত, তাঁর উপন্যাস প'ড়ে দেখুন অথবা ছোটগল্প, সেখানে বাঙালী মনে ধারাবাহিক রোমান্টিসিজ্‌ম্ নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে প্রসারিত।

ভেবে দেখুন, বাংলা সাহিত্যে পঠনযোগ্য ডিটেকটিভ নভেলও লেখা হয় না। না, ভৌতিক উপন্যাস। আমাদের কোনান ডয়েল নেই, আগাথা ক্রিষ্টি নেই, পিটার চীনি নেই, জেম্‌স্ বণ্ড নেই, আর্ল স্টানলি গার্ডনারও নেই, আছে শুধু দস্যুমোহন (যার মোহন রূপে আমরা মুগ্ধ), কিরীটি এবং ব্যোমকেশ। দস্যু মোহনের দৌরাত্ম্য যতটা অসহ্য, কিরীটির নির্বুদ্ধি টিকটিকিপণা যতটা দুঃসহ, ব্যোমকেশ তার তুলনায় অনেকখানি সহনীয় কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত নিঃশিষ্য, যেমন নিঃশিষ্য রাজশেখর বসু।

কবিতা অবশ্য আমরা অনবরত লিখে যাচ্ছি, কিছু কিছু ভালো কবিতাও কিন্তু গীতি-নাট্য, গীতি-কাব্য, মহাকাব্য আর আমরা লিখছি না। হিন্দীতে সুমিত্রানন্দন পন্থ মহাকাব্য লিখছেন বাংলার কবিরা জানেন কি? বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন, কিন্তু, হায়, তাঁকেও পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা করে আধুনিকতার চর্চা করতে হয়েছে। আমাদের ঔপন্যাসিকরা একদিকে বর্তমান জীবনের রোমান্সে অরুচি হ'য়ে ব্রিটিশ-মুঘল-পাঠান-খিলজি আমলের নকল ইতিহাসের আপাত-অসীম রোমান্সে পালিয়ে বেঁচেছেন ; আমাদের কবিরাও কি এবার রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ভাগবত যুগের অতীত পক্ষপুটে আশ্রয় নেবেন ?

এককালে ছোটগল্পের সংকলনে বই-পাড়া সরগরম ছিল। এখন প্রকাশকরা আর গল্পের বই ছাপতে চান না। বলেন, বিক্রি নেই। অথচ, পূজার বাজারের আণবিক এক্‌স্‌প্লোশন বাদ দিলেও, সারা বছর ধরে কয়েক শ' গল্প বাংলা সাহিত্যে লিখিত হচ্ছে। এদের সবগুলি কি এতই নশ্বর যে বই আকারে ক্ষণস্থায়ীত্ব

পাবারও অধিকার নেই? যেহেতু পাঠক গল্পের বই কেনেন না, এবং প্রকাশক ছাপেন না, সেহেতু, পূজা বাজার ছাড়া, আমাদের মহারথীগণ ছোট গল্প আর লেখেনও না। অথচ আমাদের খ্যাত-নামা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেরই আসল প্রতিভা ছোট-গল্পের। বস্তুতপক্ষে, বাঙালী সাহিত্যিক মানস ছোটগল্পেই সুন্দর প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্র বোধকরি পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র নির্ভেজাল নভেলিস্ট ছিলেন; শরৎ চাটুজ্যের উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পগুলি শ্রেয়; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাদ দিলে, 'গল্পগুচ্ছ' সমবেত উপন্যাসগুলিকে ম্লান করে দেয়। একালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম করা যেতে পারে, যাঁর উপন্যাস কাঁচা, কিন্তু ছোটগল্প, বিশেষ করে, মফস্বল শহরের প্রশাসনিক সমাজ নিয়ে যেগুলি রচিত, অতুলনীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক মূল্যায়নে 'অগ্রদানী'র স্থান হয়তো হবে সর্বাগ্রে; প্রেমেন্দ্র মিত্র কাব্যে প্রধান, উপন্যাসে দুর্বল, অথচ ছোটগল্পে বেশ বলিষ্ঠ। শৈলজানন্দ, বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় বাদই দিলাম। ছোটগল্পে লেখকের যে সংযম নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং শব্দ-সঞ্চয় দরকার, উপন্যাসে, অন্তত বাংলা উপন্যাসে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অধুনা, প্রকাশক 'বড় বই' চান, তাতে রয়ালটি মেলে বেশি, সুতরাং সংগঠন, সংযম, ইঙ্গিত, সংকেত সব তিরস্কৃত। বিজ্ঞাপনের নতুন ঘোষণা 'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা উপন্যাস', আমাদের রুচির মেদবাহুল্যই শুধু প্রকাশ করেছে, যদিও এক্ষেত্রে 'পৃথিবী' মানে ভারতবর্ষ; যেমন, এখনও আমাদের অনেকের কাছে 'দেশ' মানে বাংলাদেশ।

তাহলে দেখুন, বাংলা সাহিত্যকে আমরা কি দারুণ সংকীর্ণ করে রেখেছি। কেবল উপন্যাস, উপন্যাস, উপন্যাস। নাটক নেই, প্রহসন নেই, বিদ্রূপ নেই, গীতিকাব্য, নৃত্যকাব্য, মহাকাব্য নেই, প্রবন্ধ নেই, বৈঠকী আলোচনা নেই, ডিটেকটিভ নভেল

নেই, আবোল-তাবোল অর্থাৎ ননসেন্স নেই। উপন্যাসেও বহু-লাংশে একই ধরনের রোমান্টিক কাহিনী—অথবা নকল ইতিহাসের সীমাহীন, দায়িত্বহীন রোমান্সে নিশ্চিন্ত অবগাহন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর, ভালো গান রচনা করবার ক্ষমতাও আমাদের কারুর হয়নি।

এখনও তো আমাদের শুভ-দিন। আমরা যা লিখছি, আপনারা তাই পড়ছেন। (কেন পড়ছেন?)। বাংলা ভাষায় জন কুড়ি লেখকের বই-এর চাহিদা আছে, শুনতে পাই! অর্থাৎ এঁদের উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণ (যাকে আমরা বলি 'সংস্করণ') হয়ে থাকে। যাঁদের বই বেশি কাটে, যেমন তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র এবং শংকর, আমরা পশ্চাদ্‌গামীরা তাঁদের ঈর্ষা করি। কিন্তু আমাদের কারুর অবস্থাই একেবারে খারাপ নয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে কলকাতা শহরেই অন্তত পঞ্চাশ-ষাট ঘর প্রকাশক আছেন। পুস্তক-প্রকাশনা বাংলার অন্যতম কুটির-শিল্প। এঁরা সর্বদা আমাদের পেছনে লেগে থাকেন। দাদন দেন। তাছাড়া আছে, ভগবানের অসীম করুণা, পূজার বাজার। এবং সিনেমা-জগৎ, ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড্। আপনাদের অনুগ্রহে, দু পয়সা আমাদের হচ্ছে। আমরা গিন্নীদের সুখী রাখতে পারছি (গিন্নীদের যদি আদৌ সুখে রাখা সম্ভব হয়); গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে বেড়াতে যেতে পারছি; আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ি-বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছেন।

কিন্তু এমন দিন আসতে দেরী নেই, যখন আপনারা এতটা সদয় থাকবেন না। বদলে যাক না আকাশবাণীর চেহারা, আসুক টেলিভিশন, বাড়ুক সিনেমাঘর, তখন, আমরা যাই দেব আপনারা পয়সা দিয়ে তাই কিনবেন না। বলবেন, নতুন জিনিস চাই, নতুন সাহিত্য, যাতে এত প্রতারণা নেই, যাতে এই আমাদের যুগ, এই আমাদের গলিত মূল্যবোধ, এই আমাদের পথ-হারা অনুবর্তন,

এই আমাদের বিচূর্ণ মানস, বিভক্ত ব্যক্তিত্ব, তার সত্যিকার চেহারা দেখতে চাই।

অথবা এমনই কি পচা গলিত হয়ে যাবে আপনাদের রুচি যে উত্তম সাহিত্যের, বহুরূপ সাহিত্যের দাবীও আপনারা করবেন না, আমরা যাই লিখব আপনারা তাই পড়বেন, এবং বলবেন, বাহা বাহা রে?

আজ নিয়ে কাজ নেই

ব্যক্তি এবং জাতি হিসেবে অনেক ক্ষতিকর অভাবের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের অপ্রাচুর্য ও তীক্ষ্নতা বোধকরি আমাদের সবচেয়ে বেশী দুর্বল করেছে। ভারতবর্ষের প্রচীন ঐতিহ্য নিয়ে যত আমরা চেঁচাই, বিশ্বের কাছে যে-পরিমাণ তারস্বরে আমাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করি, তার একাংশেও যদি আস্থাবান হতুম, আত্মবিশ্বাসের অভাবে এত ভয়ঙ্করভাবে আমরা আহত হতুম না। আসলে আমরা স্বীকার করতে চাইনে যে প্রাচীন অতীত, তা সে যত মহানই হোক না কেন, বর্তমানের উপযুক্ত বিকল্প নয়; যে, মানুষ বাঁচে আজ, কাল, পর্শুর জন্যে, গতকাল, গততর, গততম কালের জন্যে নয়। যে 'কাল' মানে আগামী কাল এবং গতকাল, তা কালাতীত হতে পারে, কালান্তকও।

কিছুকাল আগে ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অব কালচারাল রিলেশনের উদ্যোগে (এ-সংস্থা ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়বার জন্যে মৌলানা আজাদ কর্তৃক অন্যূন পনের বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) নিউ দিল্লীতে ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সম্পর্কে একটি সেমিনার বসেছিল। ভারতের পক্ষ থেকে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ইতিহাস-রাজনীতি-কূটনীতি-প্রশাসন-সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; বিভিন্ন দক্ষিণপূর্ব-এশীয় দেশ থেকেও কয়েকজন সুখ্যাত ব্যক্তির আগমন হয়েছিল। এই ১৯৬৬ সনেও, দেখা গেল, ভারতের দৃষ্টি অতীত-প্রসারী; শোনা গেল কোন এককালে, অনেক পুরাকালে, ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা কি মহান গৌরবে সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তার প্রভাব

বিকীর্ণ করেছিল। বল্য বাহুল্য, অন্য দেশের লোকেরা আমাদের মুখ-নিঃসৃত এ-প্রকার আত্ম-বিলাস শুনে খুশি হয় না, হয় মৃদু হাসে, নয়, রাসিকতা বোধের অভাবে, গালি দেয়। তারা জানে, আমরা কেবল 'দিয়েছিলাম, দিয়েছিলাম' রবে মুখর; 'দিচ্ছি, দেব' বলবার সাহস বা পুঁজি এবং ইচ্ছা আমাদের সামান্য; 'নিয়েছিলাম, নিচ্ছি, নেব' বলতে বোধকরি আমাদের আত্মমর্যাদায় লাগে। এশিয়াকে এককালে আমরা দিয়েছি অনেক, হাত পেতে নিয়েছি সামান্য।

প্রাচীনতার দিকে আমাদের এই-যে মজ্জাগত ঝোঁক, এর সবটা খারাপ নিশ্চয় নয়; ঐতিহ্য সভ্যতার অন্যতম প্রধান শক্তি-উৎস। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনধারায় সবচেয়ে আলোকিত আজ এবং কাল; আজকাল। আমরাই যেন ধরে বসে আছি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে পেছনে: 'উই হ্যাভ এ গ্রেট ফিউচার বিহাইণ্ড্ আস্'।

অথচ, ভেবে দেখুন, আমাদের বিরাট অতীত আছে, কিন্তু ইতিহাস নেই। কতিপয় বিরল ব্যতিরেক বাদে, প্রাচীন ভারতীয়েরা ইতিহাস রচনা করেননি, যেমন করেছেন আরব অথবা চীন দেশের পণ্ডিতরা; আমাদের ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ্য পুঁথি হয় চীন নয় আরব পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী। তাছাড়া, ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাসকে মাটির গর্ভ থেকে টেনে বার করল ইংরেজ; এমন কি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃস্থাপিত মর্যাদার গৌরবও কতিপয় পাশ্চত্য পণ্ডিতদের প্রাপ্য। অবশ্য গত একশ বছরে ভারতীয় ঐতিহাসিক-গণও যথেষ্ট তৎপরতার প্রমাণ দিয়েছেন; তাঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধান ভারত-ইতিহাসকে অনেকখানি পুষ্ট ও আকর্ষণীয় করেছে। তথাপি, হালকালের দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাসের নতুন মূল্যায়ন এদেশে এখনও নিতান্ত প্রাথমিক। অধিকতর শোচনীয়, গত দুশো বছরের ইংরেজ-শাসনের দিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিপাত এখনও বড় একটা ক'রে উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রেও, গত পনের বছরে, ইংরেজ

ঐতিহাসিকগণ আমাদের চেয়ে বেশি তৎপরতা দেখিয়েছেন। আমরা ভারতীয় দৃষ্টি দিয়ে ইংরেজ শাসনের বিচার-বিশ্লেষণ করতে পরিনি বলেই বোধকরি, স্বাধীনতার সমীক্ষা পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টার বাইরে থেকে গেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রেও একই মনোভাব আমাদের পঙ্গু ক'রে রেখেছে।

প্রাচীন সমাজে প্রাচীনের দাপট থাকবে, আশ্চর্য কি? চীনে, চল্লিশ বছরের অন্তঃযুদ্ধ, জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সাম্যবাদী বিপ্লব সত্ত্বেও, প্রাচীন বয়সের দাপট এখনও প্রতিষ্ঠিত, যদিও প্রাচীন, অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উৎখাতের প্রচেষ্টা অব্যাহত। আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। অতীতকে আমরা যে খুব একটা বিশ্বাস অথবা শ্রদ্ধা করি তা নয়। কেবল, মেনে নি। প্রাচীনকে যতটা সম্মান করি, প্রশ্রয় দি তার চেয়ে অনেক বেশি। এবং নতুনকে সম্মান দেবার মত আত্মবিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা আমাদের নেই।

সাহিত্যক্ষেত্রে সব দেশেই প্রাচীন, কম-প্রাচীন ও আজকালের একত্র বিরাজ। কিন্তু, সব দেশেই, আজকের সাহিত্যই প্রধান সাহিত্য। কেননা, তাই মানুষ সবচেয়ে বেশি পড়ে, তাই মানুষকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করছে, মানুষের বর্তমান মানস ও সময়ের ওপর তার দাবীই সবচেয়ে ব্যাপক। এতে লজ্জার বা রাগের কারণ নেই। রবীন্দ্র-ভক্তগণ ক্ষুণ্ণ হলেও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদের দিনমানের কম অংশই দাবী করে এখন। আপনারা নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এখন বড় একটা পড়েন না। অন্তত রোজ পড়েন না। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রসাহিত্য গৌরব হারিয়েছে। হারায় নি। মানে শুধু এই, সব মানুষের মত আমরাও আজ, আগামী কাল ও পর্শুর জন্যে বাঁচছি। আমাদের রোজকার পড়ার খোরাক জোটাচ্ছেন গতকাল ও আজকের লেখক, এবং যাঁরা আগামী কাল-পর্শুর লেখক হবার সম্ভাবনা নিয়ে

পদসঞ্চার করছেন। প্রাচীন সাহিত্যের যে-অপ্রচুর অংশ লোকায়ত গৌরব অর্জন করেছে মাঝে মধ্যে তাতে আমরা ফিরে যাই, গিয়ে আনন্দ পাই; তা নিয়ে গবেষণা ক'রে পণ্ডিত হই। কিন্তু রোজকার পাঠ্য আমাদের বর্তমান কালের লেখক, যাঁরা আমাদের কথা, আমাদের কালের কথা লেখেন, যাঁদের সৃষ্টিতে আমরা নিজেদের নায়ক-নায়িকারূপে দেখতে পাই।

বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেক অভাবের মধ্যে অন্যতম বড় অভাব হল আজকালের সাহিত্য নিয়ে অকুণ্ঠিত স্নাতকোত্তর আলোচনা। সে আলোচনা কফি হাউসে, ট্রামে-বাসে, আড্ডায়, বৈঠকখানায়, কলেজের কমন-রুমে হলেও তার মূল্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। লাভজনক আলোচনার জন্যে চাই পত্র-পত্রিকা-বেতার ক্ষেত্রে লেখকদের এবং অধ্যাপকদের আলোচক-ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বাংলাদেশের লেখকগণ সমকালীন সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে কি অবিশ্বাস্য উদাসীন! এ যেন, যে-যার ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে, যতটুকু সাধ্যি আমরা করে যাচ্ছি, অন্য কেউ তার বিচার বিশ্লেষণ সমীক্ষা করবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করছেন না।

ভেবে দেখুন, উপন্যাস-ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজন বা দায়িত্ববোধ করেন না অন্য কোন ঔপন্যাসিকের সাহিত্য নিয়ে লিখিত আলোচনায়; তেমনি, গজেন মিত্তির, নরেন মিত্তির, বিমল মিত্তির, শংকর, সমরেশ বসু, অবধূত, মুজতবা আলি: এঁরা একজনও একে অন্যের সাহিত্য নিয়ে লিখিত আলোচনার দায়িত্ব বোধ করেন না। আমরা ঔপন্যাসিকরা একে অন্যের বই কতখানি পড়ি তা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। প্রত্যেক লেখক মনে করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ না হলেও, উত্তম লেখক; তাঁর রচনায় ঘাটতি যা আছে তা তিনি জানবেন কি করে যদি তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা না হয়?

পুস্তক-সমালোচনার নামে পত্রিকাগুলিতে যা আজকাল ঘটে থাকে তার মধ্যে বিশ্লেষণ তো নেই, আছে কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু বিশেষণ। তা ছাড়া, সাহিত্য নিয়ে আলোচনার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব সাহিত্যিকের এবং যাঁরা সাহিত্য পড়ান ও পড়েন, তাঁদের। আমাদের অধ্যাপকগণ হালকালের সাহিত্য নিয়ে সীরিয়স আলোচনা করেন না, এবং করেন না বলেই পত্রিকায় আলোচনা হতে পারে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের যতটুকু দোষ, তার চেয়ে অনেক বেশি দোষ লেখকদের, অধ্যাপকদের, সাহিত্যের মননশীল পাঠকদের।

ভাবলে সত্যিকার লজ্জা হয় যে আমাদের সাহিত্য-জগৎ কি নিদারুণ আত্মবিলাসে ডুবে আছে। আমরা সবাই নিশ্চিত জানি যে আমরা প্রত্যেকে অভিনব, শাশ্বত, চিরকালীন, বলিষ্ঠ ও দিগন্ত প্রসারী সাহিত্য সৃষ্টি করছি। কেউ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন না কোথায় আমরা হোঁচট খাচ্ছি, কোথায় আমরা ব্যর্থ, অসফল, দুর্বল ; কোথায় আমরা অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকছি রোমান্স এবং স্টাণ্ট দিয়ে ; কোথায় আমাদের উপন্যাসের গঠন ভেঙে পড়ছে ; ভাষা হয়ে গেছে পঙ্গু অথবা শব্দের হয়েছে করুণ অপব্যবহার।

বছর তিনেক আগে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনমাস ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লোক সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, সমর-শান্তি-নীতির সঙ্গে সাহিত্যও ছিল। বারোজনের এক ছোট্ট গ্রুপে সাহিত্য আলোচনা হত, আলোচনার ডাইরেক্টর ছিলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সাহিত্য-অধ্যাপক, যিনি মার্কিন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ছ'মাস ধরে চলেছিল এই আলোচনা ; এবং আমি সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম, কি যত্নের সঙ্গে অধ্যাপক বর্তমান মার্কিন সাহিত্য আমাদের কাছে দিনের পর দিন উপস্থিত করছিলেন। আমাদের ছাত্রকালে যে-সব নামকরা আমেরিকান ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকারদের রচনা নিয়ে আমরা মাতামাতি করতাম, সেই আপ্টন সিনক্লেয়ার, সিনক্লেয়ার ল্যুইস, ডস প্যাস্‌স্‌, থিয়োডোর ডেইজার, ইউজিন ও'নিল, হেনরী জেমস ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁদের নিয়ে অধ্যাপক মশাই এক সপ্তাহের বেশি কাটান নি : ধরে নিয়েছিলেন, বোধকরি, যে তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমাদের আছে, বা থাকা উচিত, বা না-থাকলে এমন কিছু ক্ষতি নেই। তাঁর প্রধান প্রচেষ্টা ছিল পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সমাগত এই পঁয়তাল্লিশটি মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেবার আজকালকার মার্কিন সাহিত্য-কৃতির সঙ্গে—আজকালের উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সিনেমা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য। তাঁর প্রধান আলোচ্য ঔপন্যাসিক ছিলেন বলডুইন, সল্ বেলস্ প্রমুখ বর্তমান কালের লেখক। এবং এঁদের কাউকে কাউকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের কাছে নিজেদের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সেলিংগারের বর্তমান মার্কিন সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং পরে একঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তর আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ভাবতে পারেন, কলকাতায় অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান? ধরুন দশজন বিদেশী এসে হাজির হলেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক সপ্তাহব্যাপী বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। হলপ করে বলতে পারি এ হেন বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে না, হলেও যৎসামান্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডেকে আনবেন সুনীতিবাবুকে, ডঃ নীহার রায়কে, বড় জোর প্রমথ বিশীকে। ডাকবেন কি, ভাবতে

পারেন কি, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, শংকর অথবা চাণক্য সেনকে ? তারাশঙ্কর বাবুকে ডাকলেও ডাকতে পারেন ; কিন্তু তিনিই কি বিদেশীদের বুঝিয়ে দেবেন উপন্যাসক্ষেত্রে আজকালকার লেখকরা কি করতে চাইছেন, কেন করতে চাইছেন, কতটুকু পারছেন বা পারছেন না ? এই তো ক-মাস আগে নিউ দিল্লীতে কংগ্রেস অব কালচারেল ফ্রীডমের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে বর্তমান সাহিত্য নিয়ে সারগর্ভ রচনা পাঠ করে গেলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সে রচনায় একজন বর্তমান সাহিত্যিকের নামও উল্লিখিত হল না।

আমেরিকার কথা তুলতে আপনাদের কেউ কেউ বলতে পারেন, ও জাতের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই, তাই ওরা কেবল আজকাল নিয়ে মাতামাতি করে। কথাটা সত্যি নয়, দুশো বছরের ইতিহাস এমন কিছু হালকা ব্যাপার নয়। আমেরিকাকে বাদ দিয়ে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের কথাই ধরুন না। ফ্রান্সে হালকালের সাহিত্য নিয়ে যে-ধরনের মাতামাতি হয় তা আমেরিকায় অসম্ভব, কারণ সাহিত্য-কলা-কাব্য ফরাসীর রক্তে প্রবাহিত। অনেক জাতীয় পুরস্কারের মধ্যে এক একটি কোন্ নতুন লেখক পাবেন, কার পাওয়া উচিত, এবং কেন, এ নিয়ে মাসের পর মাস জাতীয় সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রগুলিতে মাতামাতি চলে এবং তাতে যোগ দেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা। ইংলণ্ডে বীট্ সাহিত্য, বীটল্‌স্ গান, হালকালের অ্যান্টি-প্লে এবং উপন্যাস নিয়ে বি. বি. সি. এবং মুখ্য, গৌণ, মাঝারি পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন আলোচনা হয়ে থাকে, এ সব আলোচনায় যোগ দেন লেখকরা নিজে, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-সমালোচকগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। আপনাদের মধ্যে যাঁরা 'নিউ পোয়েট্রি' পত্রিকার পাঠক তাঁরা জানেন কি নির্দয় আন্তরিকতার সঙ্গে কবিরা একে অন্যের কাব্য নিয়ে নির্মোক আলোচনা করেন। 'এনকাউণ্টার' এর প্রতি সংখ্যায় বর্তমান

সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত ত্রৈমাসিক 'ডেডেলাস' পত্রিকায় যদি সল্ বেল্‌স্‌-এর উপন্যাস নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হতে পারে, তাহলে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় সমরেশ বসু কিংবা বিমল মিত্র নিয়ে আলোচনা কেন হতে পারবে না? সাগরময়বাবু কেন আমন্ত্রণ করবেন না দশ-বারোজন লেখককে একে অন্যের সাহিত্য নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সিম্পোজিয়ম করতে? আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র কেন এ-ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করবেন না?

কারণ, বর্তমান সাহিত্যকে, বর্তমান কালকে আমরা তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রাজী নই। কারণ, চুল পেকে সাদা না হলে, দাঁত না পড়লে, পিঠ না বাঁকলে, আমরা কাউকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলে মানতে তৈরি নই।* কারণ, আমরা সাহিত্যিকরা একে অন্যকে শ্রদ্ধা করি না, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে একে অন্যের সাহিত্যকর্ম অনুধাবন করি না। কারণ, প্রমথ বিশী হয়তো মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েই আলোচনা করা যায়, অন্নদা-শঙ্করকে নিয়ে নয়; অথবা, বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখা সময়ের অপচয়। কারণ, আমরা প্রশংসায় এত অভ্যস্ত, যে কঠিন সমালোচনার নাম শুনলেও ভয় পাই; স্তাবকতায় এমন আমাদের মজ্জাগত অভ্যেস যে অপ্রিয় সত্যভাষণকে আমরা নিরাপদ মনে করি না।

আসলে, আমাদের আত্মশ্রদ্ধা নেই। আছে আত্ম-তুষ্টি, আত্ম-সন্তোষ, আত্ম-বিলাস। আমরা নিজেদের শ্রদ্ধা করি না বলেই অন্যকেও শ্রদ্ধা করতে পারি না।

---

* একমাত্র তারাশঙ্কর ছাড়া আর কোনও আধুনিক লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স ও এম. এ. ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যতালিকায় পড়েন না!

আমি যদি কলকাতায় বাস করতুম, জনা দশেক সাহিত্যিককে নিয়ে পরস্পর-অবাধ-সমালোচনার একটি বৈঠকী কমিটি তৈরি করতুম। সে অবাধ সমালোচনা পত্র-পত্রিকা ও বেতারে প্রকাশিত ও প্রসারিত করবার চেষ্টা করতুম। তাতে বাংলা সাহিত্যের উপকার হত। অন্তত পরস্পর পিঠ চুলকানি কিছুটা কমত।

নেলসনের অন্ধ চোখ

অনতিদূর ভবিষ্যতে সম্ভবত পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ীদের বহুবিধ সমস্যার সমাধানে ভারত সরকার কিছুটা তৎপর হবেন। টাকার বিনিময় মূল্য হঠাৎ কমিয়ে দেওয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমন বই বাজারেও, নানারূপ কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। যাকে আমরা আজ বই-দুর্ভিক্ষ বলছি, তা অবশ্য বেশ কয়েক বছর ধরেই তৈরি হচ্ছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে, বিশেষ করে। দেশরক্ষার হঠাৎ-বেড়ে-যাওয়ার দাবী মেটাতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দাবী উপেক্ষিত হল; বই আমদানীর জন্যে বিদেশী মুদ্রার বরাদ্দ বছরের পর বছর কমতে লাগল। চরমে পৌঁছল গত বছর, যখন কেন্দ্রীয় বাজেটে বই-আমদানীর জন্যে বরাদ্দ হল মাত্র দেড় কোটির টাকার বিদেশী মুদ্রা। এ বছর অবশ্য তাকে তিন কোটি টাকায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, ডিভ্যালুয়েশনের আগেই; বর্তমানে, ডিভ্যালুয়েশনের পর, টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে মোটামুটি তিন কোটির কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হ'য়ে সরকারের দ্বারস্থ; তাদের সমস্যাগুলিও পত্র-পত্রিকা মারফৎ সরকার-সমীপে নিবেদিত। শিক্ষামন্ত্রী ছাগলা সাহেব সম্প্রতি জানিয়েছেন যে পুস্তক প্রকাশনার বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে তিনি একটি করপোরেশন গঠন করবার কথা ভাবছেন; হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে।

যে চিন্তা আমার মনকে পীড়া দেয় তা হল, বই-এর অভাব নিয়ে যেটুকু বাৎচিৎ হয়েছে, তার মূলে হয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট বা সম্পদকীয় নিবন্ধ; নয়তো, শ্রীচঞ্চল সরকার প্রমুখ কতিপয়

সাংবাদিকদের নিঃসঙ্গ প্রতিবাদ, নয়তো পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিতান্ত স্বার্থ প্রণোদিত যৌথ আন্দোলন। বই-এর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা, আজ বেশ কয়েক বছর যে নিদারুণ পঙ্গু হয়ে আছেন, এ নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা দেখতে পাইনি, এখনও পাইনে, সংগঠিত শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ্-মহলে। তাঁরা নিজেদের বেতন, মাগ্‌গিভাতা, ট্যিউশনি, নোটবই, দলাদলি, রাজনীতি, ব্যক্তিগত, বা সমষ্টিগত ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে এত ব্যস্ত যে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ বা আন্দোলনের সময় নেই।

আঠার বছর হল দেশ স্বাধীন: অথচ এখনও আমাদের উচ্চতর শিক্ষা কি ভীষণভাবে বিদেশী বই-এর ওপর নির্ভরশীল! বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামজনীতি নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছেন, অথবা গবেষণা, তাঁদের বিদেশী বই ছাড়া এক-পা নড়বার উপায় নেই। শুধু যে উচ্চমানের বই আমাদের পণ্ডিতগণ লিখতে পারেন নি তাই নয়, বিদেশী বই-এর কপিরাইট সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষে ছাপাবার আয়োজন এখনও নিতান্ত প্রাথমিক। এ আয়োজনে সরকারী আলস্য নিন্দনীয়, নিঃসন্দেহ; ততোধিক নিন্দনীয় আমাদের শিক্ষাবিদ্‌দের ঔদাসীন্য। গত তিন চার বছর বিদেশী বই ভারতবর্ষে ছাপবার যেটুকু প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি, তাতেও গলদ কম নয়। অধিকাংশ বই এ দেশে ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে আউট-অব-ডেট হ'য়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পুরান বই ছাপা হচ্ছে। কারণ, এ উদ্যোগের পেছনে কোনও জাতীয়-স্বার্থ-প্রণোদিত সংঘবদ্ধ সুপরিকল্পিত নীতি বা প্রয়াস নেই, কেবল আছে বাজারে পরিষ্কার এক অভাবকে এক্সপ্লয়েট করবার স্বাভাবিক ব্যবসায়ী তৎপরতা।

প্রকৃতি কোনও ভ্যাকুয়ম সহ্য করে না। ভারতবর্ষ নামক বিরাট দেশে বই নেই, এ বার্তা আমাদের কানে না পৌছলেও

বিদেশী ব্যবসায়ীদের কানে বেশ পৌঁছে গেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি আমেরিকান পুস্তক-ব্যবসায়ী এ ভ্যাকুয়ম পূর্ণ করতে পদসঞ্চার করেছেন। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ডাকযোগে এ-ধরনের দু-একটি পদসঞ্চারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন-প্রয়াস নিশ্চয় জানতে পেয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে এক বিখ্যাত মার্কিন প্রকাশন-সংস্থার প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ঃ দেখলাম, তিনি এমন ভারতীয় লেখকদের সন্ধান করছেন, যাঁরা বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতির ওপর ভাল বই লিখতে পারেন। প্রকাশনাক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার প্রথম বলিষ্ঠপ্রয়াস বোম্বাই শহরে দানা বাঁধছে। আজ আপনি 'রীডর্স ডাইজেষ্টের' ভারতীয় সংস্করণ পড়তে পারছেন; দশ বছর পরে দেখবেন, আমেরিকান বই-এর ভারতীয় এডিশন এদেশের বই-বাজার আলোকিত ক'রে ফেলেছে।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, এতেও দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার বাঙালী পুস্তক প্রকাশকরা একেবারে পিছিয়ে আছেন; এই বিরাট ভ্যাকুয়ম অন্তত আংশিক পূর্ণ করবার উদ্যোগও তাঁদের মধ্যে লক্ষিত হচ্ছে না। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার মন্দগামী হলেও, যেহেতু আমরা পঞ্চাশ কোটি মানুষ, এবং এ পঞ্চাশ কোটির শতকরা চল্লিশজন ষোলো বছরের নীচে, সেহেতু একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাকলেই, আমাদের দেশে প্রকাশন ব্যবসার বিরাট ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে শতকরা পাঁচ-ছয় জন ইংরেজী জানে; উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ইংরেজী আরও দীর্ঘকাল অপরিহার্য; অতএব, কলেজ, য়ুনিভারসিটি এবং রিসর্চ ইন্‌স্‌টিটিউটগুলিতে আজ, কাল, পরশু যাঁরা পড়বেন তাঁদের পাঠ্য-পুস্তকের বর্ধমান দাবী মেটাবার উদ্যোগ কলকাতায় প্রকাশকরা কাঁধে তুলে নিচ্ছেন না, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। যতদূর জানি, কলকাতায় একমাত্র স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানি (যাঁর আংশিক সহাধিকার

বাঙালীর) এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা ভারতবর্ষে ছাপবার জন্তে মার্কিন সহযোগিতার উদ্যোগ করছেন। বিদেশী প্রকাশকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঠ-পুস্তক ছাপছেন বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, এমন কি উত্তর প্রদেশেরও কিছু প্রকাশক; বাঙালী পুস্তক-ব্যবসায়ী নিজের কূপমণ্ডুকতায় আত্মতৃপ্তিতে বিরাজ করেই সন্তুষ্ট।

প্রকাশনা ক্ষেত্রে বাঙালী কি নিদারুণ পিছিয়ে আছেন আর একটু বিস্তারিত বর্ণনা করছি। প্রথমত, বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় বই ছাপতে তাঁরা ভয় পান। ইংরেজীতে অবশ্য কিছু বই কলকাতায় ছাপা হয়, কিন্তু সর্বভারতীয় বাজারে ব্যবসা করতে গেলে যে পরিমাণ উদ্যোগের প্রয়োজন তার অভাবে, এ-ব্যবসা তেমন জমে না। তথাপি যাঁরাই পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে ইংরেজী বই ছাপেন, তাঁরাই অনুভব করেন যে ওতে ব্যবসায়ের সুযোগ অনেক বেশি। হলে কি হবে, সে সুযোগ বাস্তবে পরিণত করবার সাহস ও উদ্যোগ তাঁদের নেই। হিন্দী বই বাঙালী প্রকাশকরা ছাপতে ভয় পান, মুখ্যত একই কারণে। 'নিউ এজ' এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম; কিছু হিন্দী বই তাঁরা ছেপেছেন, এবং দিল্লীর গোল মার্কেটে তাঁদের দোকানও আছে। শুনতে পাই, 'নিউ এজ' হিন্দী প্রকাশকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য অর্জন করতে পারেন নি; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন বলেও তো মনে হয় না। হিন্দী বই-এর বাজার বাংলা বইএর বাজার থেকে আলাদা; এ বাজারে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে অনেক কিছু অনুসন্ধান, এবং অন্তত চার-পাঁচটি রাজ্যে বিক্রির ব্যবস্থা প্রয়োজন। অর্থাৎ একমাত্র কলকাতা-কেন্দ্রিক হ'য়ে যেমন বাংলা বই-এর ব্যবসা চলে, হিন্দীতে তা হবার জো নেই; বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব ও দিল্লী, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ ব্যবসা সংগঠন করতে হয়। এ-ব্যবসার আটঘাটও ভাল জানা দরকার, যেমন ধরুন, কি ধরনের হিন্দী কোন রাজ্যে বেশি চলে, বই-এর দোকান

কোথায় বেশি, ব্যবসায়ীরা কি-প্রকার লেনদেনে অভ্যস্ত। এসব বিষয় জানতে সময় বা অর্থ বিশেষ লাগে না, যা লাগে তা হল নিজেদের কূপ থেকে বেরিয়ে আসা, এবং নতুন কিছু করবার দুর্দম্য আগ্রহ। মাঝে মধ্যে দু-একটি বাঙালী প্রকাশককে দিল্লীতে দেখতে পাই, কেউ কেউ বা দেখা করতেও আসেন; তাঁদের বলি, হিন্দী বই ছাপুন, শুনে সাময়িক উৎসাহ বোধ করেন, কিন্তু কলকাতা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সে উৎসাহ নিভে যায়।

বাঙালী প্রকাশককে হিন্দী বই ছাপতে বলি কেন, শুনুন। প্রথমত, হিন্দী ভাষীর সংখ্যা বাংলাভাষীর চেয়ে অনেক বেশি; তাই বাজার অনেক বড়। যদি আপনার ধারণা থাকে, হিন্দী-ওয়ালা বই পড়ে না, সে ধারণা ভুল। হিন্দী উপন্যাস, নাটক, কাব্য আজকাল দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে; পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অভাব নেই; আমার ধারণা, আধুনিক হিন্দী সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যিকদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন: তাদের একটা সুবিধে আছে, যা আমাদের নেই; তাঁরা বাংলা সাহিত্যের খবর রাখেন, ভাল ভাল বই বেরুলেই পড়েন, আমরা হিন্দী সাহিত্যের খবরই রাখি না। হিন্দী সমাজে বাঙালী সমাজের তুলনায় ব্যক্তিমাফিক বই বিক্রি এখনও কম, কিন্তু লাইব্রেরী অনেক বেশি, এবং কোন হিন্দী রাজ্যেই পশ্চিম বঙ্গের মত, চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সরকার লাইব্রেরীগুলির অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেননি। বাঙালী প্রকাশক-দের যেটুকু ব্যবসায় সুনাম আছে, অর্থাৎ লেখকদের যেভাবে তাঁরা নিয়মিত রয়ালটি দিয়ে থাকেন, তাতে, আমার বিশ্বাস, অনায়াসে তাঁরা উঠতি হিন্দী সাহিত্যিকদের বই পেতে পারবেন। বারাণসী, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে হিন্দী প্রেসে বই ছাপতে খরচও কলকাতার তুলনায় কম পড়বে। তা ছাড়া, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট মোটা; উপযুক্ত উদ্যোগ দেখিয়ে সরকারী সাহায্যও পাওয়া সম্ভব।

বাঙালী প্রকাশকদের হিন্দী প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ কেন হচ্ছে না তার কারণও বোঝা কঠিন নয়। পুস্তক প্রকাশনা কলকাতার অন্যতম কুটির-শিল্প। অন্যূন শ' দেড়েক 'ঘর' প্রকাশক কলকাতায় আছেন, যাঁরা সুযোগ পেলে সাহিত্য-পুস্তক ছেপে থাকেন। এঁদের মধ্যে দশটিকে বড় প্রকাশক বলা যেতে পারে, যাঁদের মূলধন লক্ষ টাকা বা তার বেশি, কুড়ি-পঁচিশটি মাঝারি 'ঘর' আছেন, যাঁদের মূলধন বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাকী সবাই চালিয়ে যাচ্ছেন কুটির-শিল্প, পাঁচ সাত হাজার টাকার ব্যবসায়, দিন এনে দিন খাওয়ার বাড়তি কোনও লক্ষ্য নেই এদের। বই পাড়ায় দেখতে পাবেন কি অলি-গলির মধ্যে দুচার দশগজ এক টুকরো ঘরে প্রকাশকদের ব্যবসা চলছে। নিজেদের ছাপাখানা আছে, এমন প্রকাশক পঁচিশটির বেশি নেই। সারা পশ্চিম বঙ্গে এবং আসাম-ওড়িষ্যায় নিজেদের সেলস্ এজেন্ট আছে এমন প্রকাশকদের সংখ্যা সাত কিংবা আট।

এরই মধ্যে ক্রমাগত ব্যবসা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে হয়তো তিন চার ভাই একত্র ব্যবসা শুরু করেছিলেন, অথবা দু'তিন বন্ধু: আজ, দেখতে পাবেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ প্রয়োজন যেখানে কয়েকটি ছোট প্রকাশক একত্র হ'য়ে একটি মাঝারি ব্যবসা প্রবর্তন, সেখানে মাঝারি ব্যবসা টুকরো টুকরো হ'য়ে ছোট ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' ভাগ হয়ে যাবার খবর আপনারা অনেকেই জানেন; মাঝারি ও ছোট ব্যবসাও যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার খবর রাখি আমরা সাহিত্য-কর্মীরা।

এই কুটিরশিল্প একদিকে ব্যবসার পক্ষে যেমন হানিকর অন্যদিকে সাহিত্যের পক্ষেও তেমনি, বা ততোধিক। শুনতে পাই চল্লিশ জন সাহিত্যিকের বই বর্তমানে বাজারে কাটছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এডিশন হবার সম্ভাবনা রাখছে। এই

চল্লিশজন লেখকের পেছনে যদি শ'খানেক প্রকাশক ঘুরে বেড়ান, দাদন নিয়ে, অনুনয় অনুরোধ নিয়ে, নানা রকম লোভ দেখিয়ে, তাহলে সাহিত্যেও যে ভেজাল আসবে তাতে আশ্চর্য কি ? চাপে প'ড়ে, লোভে প'ড়ে, দায়ে পড়ে সাহিত্যিকরা যে সাহিত্য রচনা করছেন তাতে না ব্যবসায়ীর পেট ভরছে, না পাঠকের মন।

পুস্তক প্রকাশনে নানা সন্দেহজনক ব্যাপারও এই একই কারণে ঘটেছে। বাংলা বই-এর 'এডিশন' সাধারণত এগার শ'। হিন্দী বই-এর অন্তত তিন হাজার ; মালয়ালম বইএর তিন থেকে পাঁচ হাজার। বেশি বই ছাপলে এবং বিক্রি হলে দাম কিছু সস্তা করা সম্ভব হয়, ব্যবসায়ীর লাভ বাড়ে, লেখকও বেশ কিছু রয়্যালটি পান। আজকাল ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সব কিছুরই দাম বেড়ে গেছে, বিজ্ঞাপনের তো বটেই, তাই বাংলা প্রকাশক চান, মোটা বই, যার দাম সাত থেকে বারো টাকা রাখা যায়, পঁচিশ টাকা হলেও আপত্তি নেই, কেননা কোনও কিছুরই দাম বেশি বলে বিক্রি কম নয় বর্তমান ভারতবর্ষে। কুড়ি পঁচিশ টাকা দিয়ে একখানা উপন্যাস কেনার মধ্যে যে 'আভিজাত্য' আছে, কোনও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীই তার সুযোগ নিতে অনিচ্ছুক নন। তা ছাড়া, বাংলা বইএর বাজার তো আসলে কলকাতা, এবং কলকাতার বিভিন্ন অফিস লাইব্রেরী, যারা দাম দিয়ে তুখানা ও কম দামে দশখানা বই কেনার মধ্যে পার্থক্য সর্বদা খেয়াল রাখে না। অতএব, প্রকাশক লেখককে বলেন, বড় বই দিন, যতো বড় ততো ভাল। লেখক ভাবেন, বইএর দাম বেশি হলে রয়্যালটি বেশি আসবে, তাই ক্ষতি কি ? অবশ্যি উপন্যাসের আকার যদি সাহিত্যিক দাবী মেনেও বৃহৎ হয়ে যায় তাহলে তা হবেই। কিন্তু হালকালের কয়েকখানি নামকরা উপন্যাস বিনা প্রয়োজনে, সাহিত্যের দাবী লঙ্ঘন করে, বৃহদাকার ; আমার সন্দেহ আছে, প্রকাশকরা এজন্যে কিছুটা দায়ী।

আমি বইএর ব্যবসা করি না, কিন্তু কি করে এ ব্যবসা

চলে, আমার বুদ্ধির বাইরে; ধরুন, উপন্যাসের দাম পাঁচ টাকা। প্রথম শ্রেণীর লেখক হলে আপনি রয়্যালটি পাবেন বই প্রতি এক টাকা। আপনার প্রকাশককে আরও অনেক দাবী মেটাতে হবে: বিক্রি যারা করেন, তাদের কমিশন একটাকা, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন। এসব দাবী মিটিয়ে প্রকাশকের কি ক'রে বই প্রতি একটাকার বেশি হাতে থাকে আমি বুঝতে পারি না। এতে নিশ্চয় ভালই লাভ হত, যদি প্রতি এডিশনে তিন চার হাজার ছাপা হত, বিক্রি হত। কিন্তু এডিশন তো এগার শ'-র। একসঙ্গে 'টু' এডিশনের বেশি ছাপেন এমন প্রকাশক খুবই কম; তাই, অধিকাংশ লেখকদের ধারণা, প্রকাশকরা লেখককে দেখান এগারশ', আসলে ছাপেন ও বিক্রি করেন অনেক বেশি। এ অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে আমি জানি নে. নিজের বই ছাপবার সময় এ নিয়ে বিন্দুমাত্রও আমার মাথাব্যথা হয় না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি যে বাংলা পুস্তক প্রকাশনা যে ধরনের ব্যবসা, তাতে দুরকমের হিসেব না রাখলে প্রকাশকদের কিছুই বাচবার কথা নয়। কুড়ি পার্সেণ্ট রয়্যালটিও এ ব্যবসায়েরই অঙ্গীভূত দুর্বলতা। এতো বেশি রয়্যালটি ভারতবর্ষে অন্য কোনও ভাষায় লেখকদের দেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ কলকাতায় যেহেতু চল্লিশজন লেখক আর শ'খানেক প্রকাশক, তাই রয়্যালটিও বেড়ে কুড়ি. এমন কি, চাইলে, পঁচিশ পার্সেণ্ট। লেখককে গোপনে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রকাশক যদি নেপথ্যে প্রতি এডিশনে আরও পাঁচ শ' বাড়তি বই বিক্রি করেন, তাঁকে দোষ দি' কি ক'রে? বইএর পাতায় পাতায় তো আর বিজ্ঞাপন নেওয়া যায় না।

কেরলের লেখকরা একত্র হয়ে একটি সমবায় প্রকাশনা স্থাপিত করেছেন। এ প্রকাশনা প্রতি বইয়ের এডিশন করেন পাঁচ হাজার, বইএর দাম পাঁচ ছ' টাকার বেশি রাখার দরকার হয় না। আশ্চর্য কথা হল, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রতি বই বছরে দু' এডিশনের কম

হয় না, এবং লেখক প্রতি বই থেকে চার পাঁচ হাজার টাকা রয়্যালটি পান এক এক বছর। কেরলে সবশুদ্ধ পাঁচ সাতটি প্রকাশনা আছে, বই বিক্রিও পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি বই কম নয়। সব টেক্স্ট্ বই রাষ্ট্রায়ত্ব। আমি একটি ভদ্রলোককে জানি—বিজ্ঞান বিষয়ক একখানা স্কুলপাঠ্য বই লিখে তিনি দশ হাজার টাকা রয়্যালটি পেয়েছেন দু'বছরে, এবং তিনি কোনও নামকরা লেখক নন। অর্থাৎ, দ্বিতীয় পুস্তক লেখেন নি এখনও।

কলকাতার বাঙ্গালী প্রকাশকদের মধ্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা এবং তজ্জনিত ব্যবসা ও সাহিত্যের বহুবিধ ক্ষতির প্রতিকার নির্দেশ করা সহজ নয়, কেন না প্রতিকারের আগ্রহই এখনও অনুপস্থিত। কুটির-শিল্প প্রকাশকদের সমবায় সমিতি অন্যতম প্রধান প্রতিকার, কিছু বাঙালী একত্র হয়ে ব্যবসা করতে পারে এ সত্য এখনও অপ্রমাণিত। লেখকরা নিজেদের সমবায় প্রকাশনা স্থাপন করবেন, যেমন স্থাপিত হয়েছে কেরলে, এ-সম্ভাবনাও সামান্য, কেন না লেখকদের মতে ঐক্য নেই, পারস্পরিক শ্রদ্ধা নেই, তাছাড়া বর্তমান গলাকাটা প্রতিযোগিতায় সাময়িক লাভ আছে, তদুপরি [illegible]
নিয়ে অনুসন্ধানমূলক চর্চাও হয়নি এখনও, এবং হালে বই-ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে কোন্দল চালিয়ে যাচ্ছেন, বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাতে এমন কিছু অংশ পর্যন্ত গ্রহণ করছেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রীতি কোনওদিনই ব্যাপক নয়, তাই শিক্ষা-প্রসার থেকে টেক্স্ট বই রচনা অথবা লাইব্রেরীগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান পর্যন্ত প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারী পদচিহ্ন হয় অবর্তমান, নয় ক্ষীণ। আসল কারণ হয়তো পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা; এই একটি মাত্র রাজ্য ভারতবর্ষে যেখানে পনের বছরে আর্থিক উন্নতি (রেট অব গ্রোথ) প্রায় হয়নি বললেই চলে : যা হয়েছে, শুনলে দুঃখ পাবেন, তা হল ওয়ান ফিফ্থ অব ওয়ান

পার্সেণ্ট (one fifth of one percent)। এ নিষ্ঠুর সত্যিই বা ক'জন বাঙালী জানেন? যে রাজ্যের আর্থিক-জীবন বছরে শতকরা একভাগের পঞ্চমাংশ বাড়ে, তার কাছ থেকে কি-ই বা আশা করা যায়? তথাপি, রাজ্যসরকার পুস্তক প্রকাশনার দিকে কিছু দৃষ্টিপাত করতে পারতেন, যদি তাঁদের এ-বিষয়ে কোনও পরিকল্পিত নীতি থাকত। অন্তত একটি কমিটি বসিয়ে এ-ব্যবসায়ের হাল-চাল, বাধা-বিপত্তি, সমস্যাগুলির অনুসন্ধান করতে পারতেন, যা থেকে বোঝা যেত কেন, এক্ষেত্রেও, আমরা দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে রয়েছি, পিছিয়ে পড়ছি। কিন্তু সরকারই বা কেন মাথা গলাবেন, যদি লেখক, শিক্ষাবিদ, স্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি, সংবাদপত্র এবং পাঠক সমাজ থাকেন উদাসীন?

আজকের বক্তব্য শেষ করার আগে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করব বঙ্গসমাজের নিবেদনার্থে।

আমাদের বড় প্রকাশকদের দু-তিন ঘর একত্র হ'য়ে বিদেশী বই-এর কপিরাইট সংগ্রহ ক'রে এদেশে ছাপার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ব্যবসায় একদিকে যেমন দশ বছরে ফলাও হ'য়ে উঠবে, অন্যদিকে বই-এর দুর্ভিক্ষ কাটবে অন্তত কিছুটা। ফরিদাবাদ লর্ড টমসনের নতুন প্রকাশন উদ্যোগ কি আমাদের একটুও উদ্বুদ্ধ করতে পারে না?

ছোট প্রকাশকরা একত্র হয়ে তাঁদের আলাদা সংগঠন তৈরী করুন, কেন না তাঁদের সমস্যা সত্যি কঠিন। সমবায় প্রকাশনা অসম্ভব হলেও, একসঙ্গে তাঁরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

অন্তত কয়েকটি বাঙালী প্রকাশক হিন্দী বই—গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—ছাপতে শুরু করুন। যদি আলাদা না পারেন, একসঙ্গে হাত মিলিয়ে করুন।

প্রকাশকরা নতুন পথ খুঁজুন! পেপার ব্যাক করুন—হিন্দীতে

তো বেশ চলছে একটাকা দামের পেপার-ব্যাক। বাংলায় চলবে না কেন? ইংরেজী ও বাংলায় প্যাম্‌ফ্লেট (pamphlet) প্রকাশ করুন: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীরাই সব কিনে নেবে দেখবেন।

বাংলা বই-এর বাজারে গলদের শেষ নেই। আমরা কিন্তু বেশ নেলসন হ'য়ে বসে আছি। যে-দিকে গলদ সেদিকে অন্ধ চোখটি ফিরিয়ে রাখছি।

এ্যান্ এরিয়া অব ডার্কনেস

পেটে খেলে পিঠে সয় না, সবাই জানি। পেটে না খেলে অবশ্য সবকিছু অসহ্য হ'য়ে ওঠে। এ বছর তো ভারতবর্ষের বহুস্থানে, বহুমানুষের, পেটে খাওয়া নিয়ে অনেক কষ্ট গেল। শোনা যাচ্ছে, আসচে বছরও খারাপ যাবে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাত রাজস্থান ও আরও কয়েকটি রাজ্যে এবারও বৃষ্টির অভাবে মাঠের শষ্য মাঠে শুকিয়ে গেছে, চাষীর গোলা শূন্য। নবান্ন উৎসব জমবে না এবারও। দুর্ভিক্ষ আসচে বছরও কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনসঙ্গী হ'য়ে থাকবে।

আর একটা দুর্ভিক্ষ কিন্তু বহুদিন আমাদের জীবন-সহচর হ'য়ে রয়েছে, 'নীরব দুর্ভিক্ষ'। এ দুর্ভিক্ষ সংবাদপত্রে বিঘোষিত হয় না, সম্পাদকদের লেখনীতে আগুন লাগায় না। এ দুর্ভিক্ষ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মাথাব্যথা নেই, ছাত্র বা কেরানীরা মিছিল করে না, বামপন্থীরা সরকারকে আক্রমণ করেন না, সরকার সাফাই গাইবার তাগিদ অনুভব করেন না। অথচ এ নীরব দুর্ভিক্ষ তার অন্ধকার ক্রমাগত বিস্তার করছে আমাদের মস্তিষ্কে ও মনে; চিন্তাশক্তিকে করছে দুর্বল।

বই এর দুর্ভিক্ষ।

ভারতবর্ষে অনেক জিনিসের নিদারুণ অভাব। তার মধ্যে বই-এর অভাব যে কতো বিস্তৃত ও বিপজ্জনক, আমরা ভেবেও দেখছি না। মন্দাগ্রস্ত অনেক জিনিসই কালোবাজারে চড়া দামে কিনতে পাওয়া যায়। বইএর বেলা এ কথা খাটে কেবল রাষ্ট্রীয় টেক্সট বুক ক্ষেত্রে। কলকাতায় এমন অনেক হতভাগ্য জনক-জননী আছেন

যাঁদের 'কিশলয়' কালোবাজারে চাড়া দামে কিনতে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। অথচ এ নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করে না, মাস্টার মশাইদের আহার নিদ্রা ব্যাহত হয় না, 'দেশ' পত্রিকার সুনন্দ নিরানন্দ হন না, সনাতন পাঠকের মাথা ব্যথা নেই আর পিতামাতাদের ঈশ্বরকে নালিশ জানানো ছাড়া আর কিছু উপায়ের সন্ধান করতে দেখা যায় না।

কেবল টেক্সট বুকই নয় সব রকম বইএরই নিদারুণ অভাব এদেশে।

ভারতবর্ষে পরস্পরবিরোধী সিচুয়েসনের সংখ্যা অনেক। বইএর বেলাও তাই। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে বোধকরি তের কি চৌদ্দ কোটি ভারতবাসী অক্ষরজ্ঞানী। সাত কোটি ছাত্রছাত্রী স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যায়তনে যাচ্ছে প্রতিদিন। পাঁচ বছর পরে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দশ কোটিতে। অর্থাৎ ১৯৭১ সালে আমাদের বিদ্যার্থীর সংখ্যা হবে পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ার পুরো জনসংখ্যার সমান। এবং প্রত্যেক বছর আমাদের জনসংখ্যায় সংযুক্ত হচ্ছে পুরো অষ্ট্রেলিয়ার গোটা মানুষকুল!

অথচ বইএর উৎপাদন ভারতবর্ষে বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। একটু ধৈর্য ধ'রে অবস্থাটা অনুধাবন করুন; এ দুর্ভিক্ষ আপনার সন্তান-সন্ততিদের নিদারুণ ক্ষতি করছে।

তিন বছরের হিসেব দিচ্ছি। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতবর্ষে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত বইএর সংখ্যা ছিল ২৪,৫৬৯। পরের বছর এ সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল ২১,২৬৫; এবং, ১৯৬৫-৬৬ সালে, আরও কমে গিয়ে, ২০,১১৫।

অংকে আমার মতো আপনারও আতংক থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবু আমি আরও একটু হিসেব ক'রে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে চক্ষু চড়ক।

দেখতে পাচ্ছি, প্রতি বছর সমস্ত ভারতীয় ভাষায়, এবং ইংরেজীতে, আমরা উৎপাদন করছি মাত্র একখানা বই পঁচিশ হাজার ভারতবাসীর জন্যে।

দেখতে পাচ্ছি, প্রতি বছর আমরা হাতে তুলে দিচ্ছি ছ-হাজার পাঁচ শ' অক্ষরজ্ঞানী ভারতবাসীর হাতে, মাত্র একখানা বই !!

এ দুরবস্থার শেষ নয় এখানেই। আমাদের দেশে প্রতি বছর যতো বই প্রকাশিত হয়, তার অর্ধেক বা কিছু বেশি, লিখিত হয় ইংরেজীতে। ১৯৬৫-৬৬ সালের কথাই ধরুন না। সেই ২০,১১৫ খানা বইএর মধ্যে ইংরেজীতে লিখিত বইএর সংখ্যা ১০,৩৪৭। বাকী দশ হাজারের কম বই লিখিত হয়েছে চৌদ্দ-পনেরোটি ভারতীয় ভাষায়, যার মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম।

এবং আরও ইয়াদ রাখুন, এই মোট প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে সরকারী প্রকাশন, এবং বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তক।

দিল্লী বসে বই সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। প্রকাশিত বইএর হিসেব রাখেন একমাত্র ন্যাশনাল লাইব্রেরী কলকাতা। বছর বছর একটি প্রেসনোটও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মারফৎ। 'যোজনা' পত্রিকায় সম্প্রতি একটি অনুসন্ধানমূলক নিবন্ধ রচনার জন্যে তিন বছরের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হল। তাতে ভাষা-মাফিক হিসেব রয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের কথা ধরুন। দশহাজার বই, আপনাদের বলেছি, ঐ বছর ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল হিন্দীতে ২,৩৭৬; বাংলায় ১,৪২২; তামিলে ৯৪৭; গুজরাতীতে ৯২২; মালয়ালমে, ৫৭৩, এবং তেলুগুতে, ৫১৮। কমজোর রাজ্যগুলির অবস্থা সত্যি নিদারুণ: অসমীয়ায় সে বছর প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ৬৪ খানা বই, কাশ্মিরীতে কেবল দাশখানা, ওড়িয়ায় ১২০, পাঞ্জাবীতে ১৬৬; কানাড়ায়, ২৪১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃতে ২০৭, এবং উর্দুতে ৩৭২।

শিল্পতুষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ইচ্ছে হলে নিজের পিঠে চাপড়ে বলতে পারে, লোকসংখ্যা ও আয়তন বিচার করলে বই-কৈ ব্যাপারে ভারতবর্ষে সে অন্তত দ্বিতীয়। কোন কোন ভাষায় কত মানুষের হাতে বছরে আমরা একখানা মাত্র বই তুলে দি, তার হিসেব মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়ঃ হিন্দীঃ ৫০,০০০ঃ ১; তামিলঃ ৪০,০০০ঃ ১; মারাঠী: ২৫,০০০ঃ ১; তেলুগুঃ ৭০,০০০ঃ ১। গুজরাতী ও বাংলাঃ ২৩০০০ঃ ১; মলয়ালমঃ ৭,০০০ঃ ১। দেখতে পাচ্ছেন, একমাত্র কেরলেই জনসংখ্যার তুলনায় বই-সংখ্যা সভ্য সমাজের কাছাকাছি পৌঁছেচে। ইংলণ্ডে প্রতি মাসে শ' তিনেক উপন্যাসই প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

বইএর এই যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ তার কারণ অবশ্য অনেক; এককথায় বলতে গেলেঃ অভাব। কাগজের অভাব, ছাপাখানার, লেখকের, প্রকাশকের। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতবর্ষে কাগজ ও পেপারবোর্ডের উৎপাদন অন্যূন ৫,৬০,০০০ টন। এর প্রায় অর্ধেকটাই সরকার কব্জা ক'রে নেন। সরকারী ফাইল, চিঠিপত্র, রিপোর্ট ও কিতাব দাবী ক'রে বসে আছে দেশে উৎপন্ন কাগজের অর্ধেক। ছাপাখানা সারা দেশে ক'টি আছে আমার জানা নেই, কিন্তু ভাল ছাপাখানার অভাব সর্বত্র। ছাপার কাজ শেখবার জন্যে উন্নতমানের বিদ্যালয় একমাত্র কলকাতাতেই একটি, অন্য কোথাও নেই।* তা ছাড়া আছে বই-বাঁধাই-এর লোকের অভাবঃ পুরান ভাল কারিগরদের অনেকেই ছিল মুসলমান, তাদের বেশির ভাগ চলে গেছে পাকিস্তান।

লেখকের অভাব যে কি নিদারুণ আমরা প্রায়ই ভেবেও দেখি না। এ-দেশে যাঁরা স্কুলপাঠ্য কিতাব লেখেন, তাঁদের অধিকাংশ এ দায়িত্ব পালনের অযোগ্য। বস্তুত পক্ষে স্কুল টেক্সটবুক লিখবার

* বর্তমানে, ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি, দিল্লীতে দ্বিতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে।

জন্য কোন নির্ধারিত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। আপনি আমিও লিখতে পারি, প্রকাশকের যদি তেমন মুরুব্বি থাকে যাতে স্কুলে বই চালু হয়। ন্যাশনালাইস্‌ড্‌ টেক্সটবুক কোনও কোনও রাজ্যে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত, যাদের এ কাজে আদৌ কোনও দক্ষতা নেই। এখানেও ঐ তাঁবেদারী এবং মুরুব্বির প্রশ্ন। টেক্সটবুকগুলি দু-তিন বছর বাদ পুনর্লিখিত হওয়া দরকার, অথচ এদিকে কারও নজর নেই। অনেক হিন্দীস্কুল কিতাব দেখেছি যাতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনেতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী হয় অপাঠ্য, নয় ভুলে হিজবিজ। গতবছর একখানা স্কুল কিতাব দেখেছিলাম যাতে ভারতবর্ষে তখনও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলছে! নিউদিল্লীর একটি বিখ্যাত কনভেন্টে বিদেশী-লিখিত ভারতবর্ষের ভূগোলে, কাশ্মীরকে পাকিস্তান-অধ্যায়ে রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কাশ্মীর 'ডিস্‌প্যুটেড্‌' রাজ্য। অথচ এ বিষয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। হিসেব নিলে হয়তো দেখা যাবে শতকরা ৯০ জন পিতা-মাতা খবরই রাখেন না তাঁদের ছেলে মেয়েদের স্কুল-কিতাবে কি লেখা আছে। ভুল দেখলেও প্রতিবাদের কথা ভাবেন না; পত্র লেখেন না গ্রন্থকারকে প্রকাশককে, সরকারকে অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদককে। এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, টেলিগ্রাম দেরীতে পাবার জন্যে রেগে-মেগে যিনি সংবাদপত্রে পত্র পাঠিয়েছেন, কন্যার পাঠ্যপুস্তকে 'ভারতবর্ষে এখনও ইট কেবল রোদে পোড়ান হয়' এমন সাংঘাতিক কুৎসা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও, একমাত্র কাঁধ সঞ্চালন ছাড়া অন্য কিছু অস্বস্তি তাঁর ঘটেনি।

কলেজের পাঠ্য বই ভারতবর্ষে যা ছাপা হয় তা পড়ে ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়, জ্ঞানলাভ তো নয়ই। নোট বই-এ বাজার ভর্তি; তার দৌড়ে কোনমতে পরীক্ষা 'পাস'। অর্থনীতি, রাজনীতি, ভারতীয় সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বই পাওয়া যায়, কিন্তু

দুচারখানা ছাড়া সব নীচু মানের। তদুপরি, ছদ্মবেশি। য়ুনিভারসিটি 'পেপার'-ব্যাক' বিদেশে প্রচুর, ভারতে অনুপস্থিত। 'পেপার-ব্যাক' কলকাতায় একমাত্র 'রূপা' ছাড়া অন্য কোনও প্রকাশক ছাপেন বলে আমার জানা নেই। হিন্দী প্রকাশকরা জনপ্রিয় উপন্যাসের 'পেপার-ব্যাক' ছাপেন, প্রতি মুদ্রণে অন্তত পাঁচ হাজার। শুনতে পাচ্ছি, 'চৌরঙ্গী'র হিন্দী-সংস্করণের 'পেপার-ব্যাক' হতে বেশি দেরী নেই। 'রাজকমল প্রকাশন' 'চৌরঙ্গী'র চতুর্থ মুদ্রণ বিক্রি করেছেন। 'বাক-সাহিত্য' বিক্রি করেছেন বোধকরি ১৬ শ মুদ্রণ ঃ কিন্তু 'পেপার-ব্যাকে'র চিহ্ন নেই।

আমাদের লেখকরা যেমন অলস, প্রকাশকরা তার চেয়েও বেশি। বর্তমানকালের এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের একটি গল্প-সম্বন্ধে জনৈক পাঠক 'দেশ' পত্রিকায় গতবছর একখানা পত্র লিখেছিলেন। গল্পের নায়ক এক মেজর। গল্পটিতে মেজর-কর্তৃক এমন অনেক কিছু করানো হয়েছিল, কোনও আর্মি মেজরই যা করতে পারে না। অর্থাৎ গল্পটি লেখার আগে একজন আর্মি মেজরের কতটুকু ক্ষমতা ইত্যাদি থাকে লেখক তা সন্ধান করবার গরজ বোধ করেননি, অথবা সময় পান নি। একই সাহিত্যিকের শারদীয় উপন্যাসের একখানায়* এক ইংরেজ দম্পতিকে দিয়ে এমন কথোপকথন করানো হয়েছে, যা বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের একাংশ ওয়াশিংটনের পরিবেশে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা অবাস্তব; এবং ইংরেজ আমলে গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী কদাপি নিজহাতে ভারতীয়দের ওপর বন্দুক চালিয়েছেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। বাংলা উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে অনেক সময় দেখতে পাই, লেখক তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সতর্ক ও অধ্যবসায়ী নন। শুনতে পাই, ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায়ও অবস্থা অনুরূপ, অথবা আরও খারাপ। একে আলস্য

* "চলো কলকাতা", বিমল মিত্র।

ছাড়া আর কিছু বলিনে। সুবোধ ঘোষ যে অধ্যবসায় নিয়ে 'সুন্দরম' গল্প লিখেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু যেমন নিখুঁতভাবে বিদেশী নামের বাংলা বানান সাজিয়ে দেন, 'শংকর' যে যত্নের সঙ্গে উপন্যাসের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন, অনেক লেখকদের তা নেই।*

প্রকাশকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভারতবর্ষে একটি-দুটি ছাড়া কোনও প্রকাশক বইএর পাণ্ডুলিপি উপযুক্ত লোককে দিয়ে পড়িয়ে নেন না, বা 'এডিট' করান না। ফলে অনেক বই-এ অমার্জনীয় ভুল তথ্য ও বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকাশকরা বলেন, ভুল দেখিয়ে দিলে প্রখ্যাত লেখকগণ চটে যান। আশ্চর্য তাঁরা একেবারে নির্ভুল! ভারতীয় প্রকাশকদের মধ্যে অগ্রণী বোম্বাই-এর এশিয়া পাবলিশিং হাউস: একমাত্র এঁরাই লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কেও কিছু কি বই প্রকাশ করেন, আপিস চালান। কয়েক বছর আগেও দেখেছি পাণ্ডুলিপি যত্নের সঙ্গে পড়া ও সম্পাদনা করার জন্যে এঁরা উপযুক্ত লোক রাখতেন। এখন বোধহয় আর রাখেন না। কারণ সেদিন শ্রীমতী সত্য রায়ের (পঞ্জাবিনী) 'পার্টিশন অব্ পঞ্জাব' পড়বার সময় দেখলাম, তথ্যের সমাবেশ ও বিশ্লেষণ নিপুণ হলেও, ভাষা এত দুর্বল ও ব্যাকরণে এত ভুল যে এমন একটি প্রয়োজনীয় বই-ও দুষ্পাঠ্য: গ্রন্থকার কে: অনেককেই চিনি; একজনের মুখেও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না যে প্রকাশক তাঁর বইএর উল্লেখযোগ্য ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, বা শুদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে বাঙালী প্রকাশকদের অবশ্য তুলনা নেই। তাঁরা পাণ্ডু-লিপিতে যা থাকে কেবল তাই ছাপেন না, মুদ্রণ-প্রমাদে অনেক

* বাংলা সংবাদপত্রগুলি ক্রমাগত বিদেশী নামের ভুল উচ্চারণ শেখায় আমাদের। U Thant কে বলা হয় 'উ থান্ট'- আসলে, 'উ থান'। Acheson কে বলা হত 'একিসন'; আসলে 'এ্যাচিসন'; উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষেত্রে রীতিমত প্রলয় বাধিয়ে দেন। প্রকাশকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখেছি, একখানা উপন্যাসে দশ-বিশটা ভুল-ছাপা তাঁদের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক। পাঠকরাও যে এ নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন, প্রমাণ পাই নে। চালের সঙ্গে কাঁকর, ঘি-র সঙ্গে চর্বি, চিনির সঙ্গে বালুঃ বই-ই বা কেন বিশুদ্ধ হবে?

এবার বক্তব্যটা গুটিয়ে এনে শেষ করি। ভারতবর্ষে, আপনাদের জানিয়ে রাখলাম, বইএর দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। বিদ্যার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে, বই ছাপা কমে যাচ্ছে। শুধু যে বই নেই তা নয়, যে-বই আছে, তার নির্মাণেও আমরা আদৌ উপযুক্ত যত্ন নিচ্ছি না। এ জন্যে দায়ী সরকার, লেখক, প্রকাশক এবং আপনারা। আপনারা তো আজকাল অনেক কিছু নিয়ে আন্দোলন করে থাকেন। বই চাই, ভাল বই চাই, কম-দামে বই চাই, নির্ভুল নিখুঁত বই চাই, অনেক রকম, সব রকম বই চাই, এ দাবী নিয়ে এক-আধটু গরম হয়ে উঠুন না!

আসুন, একান্তে আমরা একটু আসর জমাই। যা সাহিত্যিকরা করেন না, তাঁদের বইএর বিচার, যা সমালোচকরা করেন না, বইএর প্রকৃত আলোচনা, তা আমরা করি। আমরা করলেই আরও অনেকে করবেন, সাহিত্যিকরাও লিখতে বসে একটু সতর্ক হবেন। বর্তমান বাংলা উপন্যাস গল্প এত তরল তার কারণ পাঠকদের কঠিন বিচার নেই। আসুন এবার শুরু করা যাক।

[অক্টোবর, ১৯৬৬

আপনারা মানবেন সুন্দরের রুচি-গঠন চর্চা-সাপেক্ষ। সঙ্গীত বলুন, কলা বলুন, চর্চা ব্যতীত রস ও আনন্দ অনুভূতি সম্ভব নয়। মার্গসঙ্গীত শুনে আমার মত আপনারও যদি নিদ্রা আসে কিংবা জৃম্ভনপ্রবৃত্তি হয়, দোষ গায়কের নয়, আমার ও আপনার সঙ্গীতে নিরক্ষরতার। অ্যাবষ্ট্রাক্টআর্ট দেখে যদি আপনি ফ্যালফ্যাল চোখ দাঁড়িয়ে থাকেন, তার কারণ আর্ট বোঝবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ পাঠে আপনি অবহেলা করেছেন। সাহিত্যও একই পর্যায়ের। সাহিত্য পড়ে তার রূপ-রস-আনন্দ পেতে হলে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার, রুচিকে চর্চা দ্বারা শানিত করা প্রয়োজন। তা নাইলে, মুড়ি-মুড়কি আপনার জিহ্বায় এক-স্বাদ মনে হবে, আসল কি নকল, খাঁটি কি ভেজাল, চিনতে পারবেন না। একদা জনৈকা পাঠিকা আমাকে একটি উৎসাহ-ব্যঞ্জক পত্র লিখেছিলেন। উত্তর দেবার পর তিনি সত্যিই করলেন পত্রঘাত! লিখলেন, আপনার লেখা আমার খুউউউব ভাল লাগে, এবং তেমনি ভাল লাগে ন. গ. মশাই-এর লেখা! পাঠিকার বিশেষ দোষ নেই, আমরা অনেকেই বিভিন্ন আস্বাদের সাহিত্য একসঙ্গে উপভোগ করি। আমার যেমন গ্রাহাম গ্রীন পড়তে ভালো লাগে, তেমনি, কিংবা তারও চেয়ে নিবিষ্ট নেশায়, আমি, মাঝে মধ্যে, আর্ল ষ্ট্যানলী গার্ডনারের পেরী ম্যাসন পাড়। কিন্তু তাই বলে গ্রাহাম গ্রীন ও আর্ল ষ্ট্যানলী গার্ডনারকে আমি একসঙ্গে সমান-উপভোগ্য 'সাহিত্যে'র পর্যায়ে ফেলব না। একজন সাহিত্যিক, অন্যজন লোকরঞ্জক। একজন মোগলাই কুর্মা, অন্যজন আলুর টিকিয়া।

সাহিত্যরুচি শানিয়ে তুলতে গেলে সাহিত্য নিয়ে আপনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। মাথায় বা মনে জাগবে প্রশ্ন, তার উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। এ দায়িত্ব অগ্রসর দেশে অনেকখানি পালন করেন সমালোচকরা। বাংলা সাহিত্য, দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমানে সমালোচনার বাইরে। এমন একখানা পত্রিকা নেই যাতে পুস্তক-সমালোচনা নামক বিলাসিতা চোখে পড়ে। 'পুস্তক-পরিচয়' নামে যা প্রকাশিত হয়, তা খেয়াল-খুশি, বাণিজ্য-স্বার্থ, গোষ্ঠী-তৎপরতা-জনিত বইএর বিজ্ঞাপন ছাড়া বেশি কিছু নয়। অথচ এই ধরুন মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্তও বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনা কি বলিষ্ঠ ও ব্যাপক ছিল। জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কি নিদারুণ বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিল, বর্তমান কালের বহু-সংস্করণ-পুরস্কৃত লেখকদের তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। আজ হঠাৎ আমরা কেউ বিন্দুমাত্র ক্রিটিসিজি্ম্ সহ্য করতে রাজী নই। আজ হঠাৎ আমাদের সমবেত দাবী: প্রশংসা ও স্তাবকতা।

অথচ পপুলারিটি যে সাহিত্য-সৃষ্টির কি দারুণ অন্তরায় তাও আমরা ভেবে দেখি না। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়লেই আমরা অপমানিত, উপেক্ষিত বোধ করি। এর ফলে যে সস্তা অহংকার জন্মায়, তার একটা উদাহরণ দি, শুনুন। সম্পাদকরা, দেখে থাকবেন, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা কদাচ এডিট করেন না। অর্থাৎ বানান, ব্যাকরণ, তথ্য সমাবেশ ইত্যাদিতে ভুল চোখে পড়লেও তার সংশোধন হ'তে দেখবেন না। সম্পাদকদের প্রশ্ন করলে জবাব শুনতে পাই, লেখকরা চটে যাবেন, বরদাস্ত করবেন না। এ এক সাংঘাতিক অবস্থা! এমনি নাকি আমাদের আত্মাভিমান যে পরিষ্কার ভ্রম-ত্রুটি-বিচ্যুতি (কার না এসব ঘটে?) পর্যন্ত অন্যের হাতে সংশোধিত হতে দেখলে আমরা আহত হই, গোসা করি। এ আত্মাভিমান যদি সৎসাহসে বলিষ্ঠ

হত, তাহলে কর্তার ইচ্ছেয় অনেক কর্ম সর্বদা অমরা ক'রে যেতাম না, শক্তের ভক্ত হ'তে কিঞ্চিৎ আমাদের সরম লাগত। যেহেতু বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা আমাদের ঔদার্যের ওপর একান্ত-নির্ভর, যেহেতু তিন-চার জন 'বিখ্যাত' লেখকের 'পূর্ণ উপন্যাস' ব্যতীত কোনও শারদীয় সংখ্যাই বাজারে কল্কে পায় না, তাই নির্বিচারে আমরা আত্মাভিমানের লাঠি দেখিয়ে স্বচ্ছন্দে সেতু পার হতে পারি।

পত্রিকা-ওয়ালাদের কথা, তাই ছেড়ে দিন। তাঁরা এবং আমরা লেখকরা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বাংলা সাহিত্যের শ্মশান সাজিয়ে তুলছি। এর মধ্যে ভরসা পাঠক-পাঠিকারা। তাঁদের সাহিত্যরুচি বলিষ্ঠ হলে, এ ষড়যন্ত্র একদিন ভেঙে পড়বে, বাংলা সাহিত্যের আবার সুদিন আসবে। তাই আপনাদের আলোচনা-আসরে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

লেখকদের আমন্ত্রণ জানাবার দুঃসাহস আমার নেই। তবু তাঁদের কাছে সামান্য নিবেদন আছে। দুতিন মাস বাদ দিয়ে, এ সংখ্যা নিয়ে 'একান্তে'র প্রথম বর্ষ শেষ হল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে বসে 'একান্তে' আমাকে লিখতে হয়ঃ কলকাতার অনেক সাহিত্য-সাহিত্যিক-সংবাদ আমার অজানা থাকে। 'উল্টোরথে'র সম্পাদকগণ 'একান্তে' লিখবার সুযোগ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ঘটে না বললেই হয়। তবু শুনতে পাই পাঠক-পাঠিকা মহলে অনেকেই 'একান্তে'র প্রতি বীতরাগ নন। যাঁদের নিয়ে আমার প্রধান বক্তব্য বাংলা দেশের লেখক ও প্রকাশকগণ, তাঁদের অন্তর আমার প্রতি প্রীতি ও স্নেহে বিগলিত হয়ে উঠবে এমন দুরাশা আমার নেই। কিন্তু তাঁরা যদি অন্তত এটুকু মেনে নেন যে কারুর প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই, তাহলে আমি বাধিত হই। আমি নিজেও যখন সাহিত্যচর্চা করে থাকি, তখন সাহিত্য-আলোচনায় সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমার পক্ষে অপরিহার্য। আমরা সবাই

একটা অত্যন্ত কুৎসিত সিসটেমের মধ্যে আটকে গেছি, এর থেকে বার না হতে পারলে সত্যিকারের ভাল সাহিত্য তৈরি আমাদের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এ সিসটেমের মধ্যে বাঁধা পড়ে আমরা একেই আরও পাকা পোক্ত করে তুলছি। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর দুর্দশা যে অবস্থায় চরম আকার ধারণ করে, আমরা তাতে প্রায় উপনীত হয়েছি।

এই সিসটেমটা কি? একদিকে সহজবোধ্য কারণে বইএর চাহিদা বাড়ছে। কেবল সাহিত্যপুস্তক নয়, রেডিও, নাটক ও সিনেমাও লেখকদের জন্যে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি নিদারুণ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। ব্যবসায় তৈরি করতে গেলে অনেক নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করতে হয় আমরা সবাই জানি, এতে অবাক হবার কিছু নেই। পুস্তক-প্রকাশনেও গলা-কাটা ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা বেঁচে নেই। সিনেমার যুগে পাঠকরুচি কিছুটা তরল হতে বাধ্য, কিন্তু সাহিত্য সে রুচিকে তরলতর করছে। পত্রিকাসম্পাদকরা নতুন সাহিত্যিক তৈরি করবার পথে পা না বাড়িয়ে, ব্যাপক আত্মতৃপ্ত আলস্যে, 'প্রতিষ্ঠিত'দের প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীদের মত ও পথের সাহস গেছে স্তিমিত হ'য়ে, প্রতিবাদ হয়েছে নীরব। বইএর বাজারের সঙ্গে অন্য বাজারের আর ভেদ নেই।

শিক্ষা ও বিদ্যা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে অনেক নতুন লেখক তৈরি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি, হবার কোনও লক্ষণও নেই। মহাযুদ্ধের সময় যাঁরা প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে সাহিত্য-আসরে উদিত হয়েছিলেন, আজ তাঁরাই একত্রে বিরাজ করছেন। 'কল্লোল' যুগে বিরাট প্রতিভা-বিস্ফোরণ ঘটেছিল, পঞ্চাশের দশকে তাঁর কেন পুনরাবৃত্তি হল না? বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রথম পংক্তিতে এখনও যাঁরা সমাসীন, তাঁদের প্রতিভা

তিরিশ ও চল্লিশ দশকে পূর্ণ প্রতিভাত হয়েছিল, অথচ গোধূলি আলোকে এখনও তাঁরা সমান প্রতিষ্ঠিত। এতে তাঁদের দোষ নেই, দোষ আমাদের, আমরা যারা তাঁদের আজ পর্যন্ত কক্ষচ্যুত করতে পারি নি। একদা রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহে বাংলাসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। সে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি হল না কেন? কেন আমরা একালের ঔপন্যাসিকরা আবার শরৎ চাটুজ্যের পথে ফিরে গেলাম? যে বিরাট সম্ভাবনার জ্বলন্ত স্বাক্ষর একদিন অন্নদাশংকর, বনফুল, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য-কুমার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এসেছিলেন, সাতচল্লিশের 'গ্রেট ডিভাইড' অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশের পথে কেন তা হারিয়ে গেল? কেন হঠাৎ বাংলা সাহিত্য বাস্তুহারা, কেরানী-মাস্টারনী, কলকাতার গলিত শব-ব্যবচ্ছেদে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক রোমান্সের রেশমী কুয়াটিকায় পরাজিত আশ্রয় খুঁজল?

এ সব প্রশ্ন যদি না তোলা হয়, যদি-না এদের উত্তরের সন্ধানে আমরা মস্তিষ্ক নিয়োগ করি, তাহলে আগামী কালেও বাংলার সাহিত্যপ্রতিভার পুনর্বায় বিস্ফোরণ হবে না। এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে।

বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়িত্ব আমাদের সবার। কাম্যু তাঁর 'দি ফল্' উপন্যাসে লিখেছেন, যখন সবাই আমরা জানবো, মানবো যে আমাদের প্রত্যেকে দোষী, তখনই গণতন্ত্র আবার বেঁচে উঠবে। সাহিত্যকে আমরা যে অবস্থায় নামিয়ে এনেছি, তার জন্যে দায়িত্ব আমাদের সবার সমান; কেউ একটু কম কেউ বা একটু বেশি দোষী, কিন্তু নিরপরাধ একজনও নই। পরোক্ষে উপরোক্ষে আমরা প্রত্যেকে এ অবস্থার সৃষ্টিতে সাহায্য করেছি, আজও করছি। তাই আমার বিনীত অনুরোধ, কোনও লেখক যেন না মনে করেন তাঁর সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর প্রতি আমি বিশেষ কোনও কটাক্ষ করছি। অন্য কথায়, 'একান্ত' লিখতে গিয়ে আমার কাউকে

বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত আঘাত করবার ইচ্ছে নেই। আমার আলোচ্য বর্ত্তমান সাহিত্য-সিচুয়েশন। তার সঙ্গে আর একটা কথাও অবশ্য বলা দরকার। সাহিত্যিক তো আর লুকিয়ে লুকিয়ে রচনা করেন না। তিনিও লোকরঞ্জক এবং লোকের রুচির বিধায়ক। কেবল মালাই কুড়োবেন, পাটকেলটি খাবেন না, এমন আব্দার তাঁর পক্ষে অশোভন। তাঁর রচনা পাঠক সমাজের বিচার সাপেক্ষ, যদি অবিচার হয় তিনি নিশ্চয় প্রতিবাদ করতে পারবেন, সুবিচারের শাস্তি তাঁকে হাত পেতে নিতেই হবে।

টীন-এজ সাহিত্য চাই

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এডুকেশন কমিশনের বিপুলাকার রিপোর্টের প্রথম বাক্যটি পড়তে গা শিউরে উঠেছিল। 'দি ডেস্টিনি অফ ইণ্ডিয়া ইজ নাউ বিয়িং শেপ্ড্ ইন হার ক্লাসরুমস্' : ভারতের ভাগ্য তৈরি হচ্ছে স্কুল কলেজের ক্লাসে ক্লাসে। পাঠকদের লক্ষ্য করে বলছি, হয় আপনার ছেলে, নয়তো ছোট ভাই, হয়তো আপনি নিজেই, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ভারতের ভাগ্য নির্মাণ করছেন। সে ভাগ্য কি ধরনের? প্রায় দু-মাস বন্ধ থাকার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবশেষে খুলল, কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি যা হয়ে গেল তা অপূরণীয়। ছাত্র-বিক্ষোভ অবশ্য আজ আর পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত উত্তর ভারত, আসাম থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত, ক্লাসরুমে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তেলহীন দীপে সলতের মত নিবু নিবু।

অথচ এ দারুণ সমস্যা নিয়ে আমরা যতটা বকছি ও লিখছি তার অর্ধেকও চিন্তা করছি না। মাস্টারমশাই ও শিক্ষিকাগণ পেটের দায়ে নিজেরাই রাজপথে মিছিল করছেন, অথবা রাজভবনের সামনে সত্যাগ্রহ করে কারাবাসী হচ্ছেন। ছাত্রদের কথা ভাববার সময় তাঁদের নেই। যাঁরা সরকারী নেতৃত্ব করছেন, তাঁরা অহরহ যে-সব উপদেশ-বাণী ছাড়ছেন তা ছাত্রদের কানেই পৌঁছচ্ছে না, মর্মে তো দূরের কথা। বাপ-মা বড় ভাই, কাকা, জ্যেঠা, মামাদের দুশ্চিন্তা ঘটছে নিশ্চয়, কিন্তু সমস্যার কোনও সামাধান তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাগণ ছাত্র-বিক্ষোভের মধ্যে অদূরবর্তী নির্বাচনে ভোটলাভের সুযোগ দেখছেন, আপাতত এর বেশি

দূরদৃষ্টির প্রয়োজন তাঁদের নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের ক্লাসঘর বন্ধ হওয়া অথবা পঠন-পাঠনে আগুন লাগার মতো জাতীয় সমস্যা আমরা যেন মানতে রাজী নই ; আমরা যেন ভাবতে চাই, রজনীর দুঃস্বপ্নের মতো এ দুর্ঘটনা দুঃসহ হলেও ক্ষণস্থায়ী, ঘুম ভাঙলেই দেখা যাবে, সর্বনাশটা সত্য নয়, সাময়িক পীড়াদায়ক মিথ্যা মাত্র।

আমাদের সঙ্গে ছোটদের মানসিক আদানপ্রদানের রাস্তাগুলি বড় বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের আমরা ভালবাসি, তাদের উন্নতির জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে বিমুখ নই ; বরং, সংসার যেহেতু ক্ষুদ্রাকার, তাদের নিয়ে স্নেহ-উদ্বেগ-আহ্লাদের বেশ একটু বাড়াবাড়িই আমরা করে থাকি। একথা নিশ্চয় সত্যি যে আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ভাল খায়, পরে, আনন্দ করবার সুযোগ পায়, তাদের বাপের উপার্জন যাই হোক না কেন। অথচ ছেলেমেয়েদের বড় হবার পথে যে হাজার রকমের সমস্যা দেখা দেয়, ঘনিষ্ঠ বাস্তব ভাবে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতোটুকু ?

আমরা কি একবারও ভেবে দেখি কি ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে আমাদের সন্তানদের বড়-হওয়া ব্যাপারটা, কতো নতুন সমস্যা, ঘটনা এবং ভাবনার সঙ্গে আজ তাদের একাকী মোকাবিলা করতে হচ্ছে, এবং এ সম্পর্কে আমাদের কাছ তারা প্রায় কোনও সাহায্যই পাচ্ছে না ? আমরা বলি, ছোটবেলায় আমরা নিজেরাও তো একা একাই বড় হয়েছি, কে এগিয়ে এসেছে আমাদের পথের সন্ধান দিতে ? কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের বাল্যজীবনের সঙ্গে তুলনাক্রমে বর্তমান কালের বাল্যজীবন কি ভয়ানক বদলে গেছে, কতো পরিবর্তন ঘটেছে সমাজে, পরিবারে, গ্রামে, নগরে ; কি অচেনা হয়ে গেছে এ যুগের মূল্যবোধ মূল্যায়ন। আমাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবন কাল ছিল অনেকখানি গ্রামীন ; একান্নবর্তী পরিবারে বহু মানুষের বিভিন্ন প্রভাবে আমরা গড়ে উঠেছি, আমাদের মূল্যবোধ ছিল বহুলাংশে ট্রাডিশনাল, তার ওপরে বর্তমান সভ্যতার জুলুমবাজি

ছিল কত সীমিত। আজকাল ছেলেমেয়েদের জীবন বহু অচেনা অজানা প্রভাবের সম্মুখীন, অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদানপ্রদান প্রায় নিঃশেষ। একালের নবীনদের যে সব সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়, সহানুভূতি ও সম্মানের সঙ্গে যদি আমরা তার সমাধানে তাদের সাহায্য করতে না পারি তাহ'লে নবীনরা এমন কিছু ক'রে বসবে যাতে তাদেরও ক্ষতি, আমাদেরও।

যে কারণে বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের ধরে রাখতে পারছে না, ছাত্ররা অহরহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে আর ইটপাটকেল ছুঁড়ছে, তার আশু মীমাংসা হবার পথ দেখি নে। কারণ, পিতা হিসেবে যেমন, জাতি হিসেবেও তেমনি, নবীনদের নিয়ে আমরা যতো চেঁচাই তার অংশমাত্রও মাথাব্যথায় বা বিনিদ্রায় কষ্ট পাই নে।

ভারতবর্ষের একশ' জন মানুষের মধ্যে ৪১ জনই হল নাবালক, অর্থাৎ পনের বছরের নীচে; নাবালকদের প্রাধান্য আরও বহু বছর থাকবে। অথচ দেশের এই বিরাট, প্রায় অর্ধেক, মানুষের জন্যে রাষ্ট্রের ব্যয় এখনও যৎসামান্য। * শিক্ষার প্রসারে ভারতবর্ষ গত পনের বছরে মাথা পিছু যা ব্যয় ক'রে আসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করছে বর্মা, সিংহল, মিশর, ঘানা, ফিলিপাইন্‌স ও আরও অনেক দেশ।

এবং ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ব্যয় নিম্নতম না হলেও নিম্নতম খাতে তো বটেই। ফলে, শিক্ষিত ব'লে যতোই না আমরা গর্ব করি, পশ্চিমবঙ্গে হস্তাক্ষরজ্ঞানীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ঊনত্রিশ। লিটারেসিতে অখণ্ড বাংলার স্থান ছিল ১৯৫১ সালে সারা ভারতে চতুর্থ : পশ্চিমবঙ্গের স্থান অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় নেমে এসেছে নবমে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল, এখনও আছে, অনেক বেশি।

বিভিন্ন রাজ্যের এডুকেশন বাজেট দেখলে বুঝতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কি দারুণভাবে পনের বছর অবহেলিত হয়ে আসছে। মহারাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যে যে ব্যাপক বেসরকারী প্রচেষ্টা দানা বেঁধে উঠেছে তার সমতুল কিছু পশ্চিমবঙ্গে এখনও চিন্তার বা পরিকল্পনার মধ্যেই আসে নি। ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে অক্ষরজ্ঞানে মাদ্রাজের স্থান ছিল সপ্তম; ১৯৬১ সালে মাদ্রাজ হয়েছে পঞ্চম। ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে সবচেয়ে পেছনে-পড়া রাজ্যগুলির অন্যতম। প্ল্যানিং কমিশন এ বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অপ্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৬০ পর্যন্ত বৃত্তি, জলপানি আন্যান্য সাহায্য দিয়ে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার পথ সুগম ক'রে দিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য নয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অদ্ভুত'।

মিডল স্কুল ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ১৪.১ জন ছাত্র বিনা খরচে শিক্ষা পাচ্ছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও শতকরা মাত্র ৩০জন ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় সরকার বহন করছেন না। আর মাধ্যমিক ক্ষেত্রের পরে, এ সংখ্যা নেমে এসেছে শতকরা মাত্র ৭.৫ জনে। এবার এই তিনক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি রাজ্যের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন: উত্তর প্রদেশেও মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাচ্ছে শতকরা ৪৩.৩ জন ছাত্র; তার পরের ক্ষেত্রে, শতকরা ১৯.৯ জন। রাজস্থানে মেয়েদের শিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক। ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে শতকরা ৭৮.২ জন বিনা বেতনে পড়তে পারছে; তৃতীয় ক্ষেত্রে, শতকরা ২৬.৪ জন। পাঞ্জাবে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে শতকরা ৬৮ জনের বেতন দিতে হচ্ছে না। ওড়িষ্যায় একশ' ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৪.৩ জনের মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ মিলছে; কলেজে শতকরা ১৯.১ জনের বেতন লাগছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারসিপ সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে,

'In so far as scholarships are concerned, West Bengal stands at the lowest end of the ladder with only one percent of the total enrolment getting scholarships and stipends.'

১৯৬০ সালের পর ছ' বছর আরও অতিক্রান্ত হল, কিন্তু এর মধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে ; পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-প্রসারের উদ্যোগ কমেছে বৈ বাড়ে নি।

এ অবস্থার প্রতিকারের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে জাগ্রত জনমতই বা কোথায়? ছাত্ররা অন্ধ আক্রোশে লেবরেটারীতে আগুন লাগাচ্ছে, স্কুল-কলেজের চেয়ার-টেবিল ভাঙছে, পরীক্ষার হল থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে রাস্তায় মিছিল করছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতির জন্যে, আরও স্কুল চাই, লেবরেটারী চাই, সস্তা দামে ভাল পাঠ্যপুস্তক চাই, স্কলারশিপ চাই, বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ চাই এ-সব দাবী নিয়ে গঠনমূলক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন কোথায়? শিক্ষকরা নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্যে আন্দোলন করুন, দোষ দেব না; কিন্তু দোষ নিশ্চয় দেব, যখন দেখি ছাত্রছাত্রীদের উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে, শিক্ষাবাবদ আরও সরকারী ব্যয়ের জন্যে, ভালো পাঠ্য-পুস্তকের জন্যে, তাঁদের কোনও উচ্চারিত উদ্বেগ নেই। কঠিন হলেও একথা সত্য যে শিক্ষকদের মাইনে যে মাপে বেড়েছে, শিক্ষায় তাঁদের আগ্রহ ও আন্তরিকতা ততোটা বাড়ে নি। আসলে, স্কুল মাস্টার আজকাল আর কেউ হতেই চান না। দিল্লীর বিখ্যাত মডার্ন স্কুলে বর্তমানে শিক্ষকদের বেতন চারশ থেকে বার শ' করা হয়েছে, সঙ্গে নিখরচ বাসস্থান। তথাপি উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বরং দু'শো টাকা মাইনেতে কলেজে 'প্রফেসর' হবো (এদেশে কেউ 'লেকচারার' নন, সবাই 'প্রফেসর') পাঁচশ' টাকার বেতনে স্কুল মাস্টার হবো না। কারণ,

স্কুল মাস্টার সমাজে কল্‌কে পান না। তাঁর পেশা নিয়ে অহংকার নেই, সন্তোষ নেই। সমাজ তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেয় না।

এই অবস্থার কোনও প্রতিকার দেখতে পাইনে, আমূল সংস্কার, অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া। অন্যকে ও নিজেদের অহরহ প্রতারণা করবার যে সীমাহীন ক্ষমতা আমরা উত্তরাধিকারে পেয়েছি এবং নিজেরা অর্জন করেছি, নবীনদের ভাগ্য নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্ণমালা ও হিতোপদেশ থেকে শুরু ক'রে রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণ পর্যন্ত, সর্বদা প্রতিদিন আমরা অনর্গল ছোটদের বড় বড় উপদেশ দিয়ে আসছি, বাণী শোনাচ্ছি; অথচ তাদের জীবনকে সত্যি করে তৈরি করবার জন্যে যে স্বার্থত্যাগ, দূরদৃষ্টি, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় দরকার, তা আমাদের নেই।

ভাবলে বিস্ময় লাগে যে বিস্তীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে নবীনদের নিয়ে এখনও পর্যন্ত একখানা প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস রচিত হয়নি। 'শিশু-সাহিত্য' আমাদের আছে, শিশুদের জন্যে বই। কিশোর সাহিত্যে এসে আমরা প্রথম হোঁচট খাচ্ছি। দেখুন না, বর্তমান মহারথীদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া আর কেউ বড় একটা কিশোর সাহিত্য লিখতে চেষ্টাও করেন না। ছোটদের জন্যে লেখা বেশির ভাগ বই-ই ছোটদের পড়তে ভালো লাগে না। আসলে কিশোর বা বালকদের ভাষা, মনোভাব, এক কথায় বাল-কিশোর-মানস, আমাদের অচেনা, অনায়াত্ত।

তের চৌদ্দ থেকে সতের আঠার বছরের (টীন-এজ) সাহিত্য বাংলা ভাষায় একেবারে নেই। আপনার ছেলেমেয়ে হয়তো রাশি রাশি ইংরেজী নভেল পড়ছে—বিদেশে টীন-এজ লিটারেচার এক বিরাট ব্যাপার—কিন্তু মাতৃভাষায় আপনি তাদের কিছু দিতে পারছেন না। আপনার টীন-এজ মেয়ে যদি ইংরেজী উপন্যাসের পোকা হয়ে থাকে, তাকে জিজ্ঞেস করুন, এক নিশ্বাসে একপাল লেখিকার নাম বলে যাবে—জর্জেট হেয়ার, জেন ফ্রেজার, নেটা

মাস্কেট, বারবারা কার্টল্যাণ্ড, হারমিনা ব্ল্যাক, ডেনিস রবিনস্। বাংলা উপন্যাসের যে-গতানুগতিকতা, ঔপন্যাসিকদের আলস্য এবং প্রকাশকদের নতুন-কিছু-করবে-না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, টীন-এজ লিটারেচারের পূর্ণ অভাব তার অন্যতম ফল। আমরা ছেলেবেলায় দময়ন্তী, বেহুলা, সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হতাম বলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও তাই হবে, এমন অন্যায় দাবী মহাকাল কদাচ মানবে না। যুগ বদলেছে, অথচ বঙ্গ সাহিত্যিক যুগোপযোগী সাহিত্যের দাবী মেটাতে পারছেন না, এ তার আর এক প্রমাণ।

শিশু সাহিত্যের বাইরে নবীনদের নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্য যে সৃষ্টি সম্ভব, এ কি আমরা জানি? ভাবতে আশ্চর্য লাগে আজ পর্যন্ত একজন বাংলা ঔপন্যাসিক জন্মান নি যিনি সাহিত্যে নবীন জীবনের ওপর প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিপাত করেছেন।* রবীন্দ্রনাথে এক-আধটু আস্বাদ যদি-বা মেলে, শরৎচন্দ্রে যদি-বা 'রামের সুমতি' এখনও বর্তমান (যদিও মাতৃস্নেহে প্লাবিত), তারপরে, একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' এবং 'জীবন্ত' ছাড়া, আর কোথাও এ দৃষ্টিপাতের সন্ধান পাই নি। কলেজের ছাত্রছাত্রী অনেক সাহিত্যিকের উপন্যাসের 'চরিত্র' হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু পড়ে কেবল মনে হয় আমরা প্রাপ্তবয়স্ক চোখে ও মনে টীন-এজকে দেখতে শিখি নি।

এক্ষেত্রেও বিদেশে পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত ঘটেছে, আমরা পড়ে আছি যে পেছনে, সে পেছনে। মার্কিন উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ পুস্তক মার্ক টোয়েনের হাকল্‌বারি ফিন: একটি টীন-এজ ছেলের কাহিনী। সেই একই ধারা প্রবাহিত হয়ে রূপ নিয়েছে সালিঙ্গারের 'ক্যাচার ইন্ দ' র‍্যাই', একটি স্কুল-ছাত্রের কাহিনী, প্রাপ্ত-বয়স্ক চোখে দেখা। অনেক টীন-এজ আমেরিকান ছেলেদের

* এক্ষেত্রে বিমল কর ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন 'খড়কুটো' উপন্যাস লিখে।

মুখে শুনেছি, হোলডেন কলফিল্ড তাদের জীবনের বাস্তব প্রতীক। বাংলা উপন্যাসের টীন-এজ চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয়ে ক'জন বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে আত্ম-আবিষ্কারে চমকে ওঠেন? আমি কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে নরেন মিত্তির পর্যন্ত সবার উপন্যাসে একই ধরনের একই কাঠামোর টীন-এজ চরিত্র দেখতে পাই—শাড়ী-ব্লাউজ, গহনা, হাবভাবের এক আধটু অদল-বদল ছাড়া। যেমন অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে কলেজে-পড়া মেয়েদের দেখে আমি চিনতে পারি না, মনে হয় সুচরিতা, বিজয়া, বন্দনাকেই বার বার দেখছি।

তাহলে দেখুন, আপনার টীন-এজ ছেলেমেয়েদের আপনি ছাড়া দ্বিতীয় বন্ধু নেই। সরকার তাদের কৃপণ হাতে যা দিচ্ছেন, তাতে তাদের মন ভরে না, অদূর ভবিষ্যতে ভরবে বলে ভরসা পাই নে। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা তাদের জন্যে সময় অপচয়ে রাজী নন। বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা তাদের কেবল নাচিয়ে বেড়াতে চান, তার বেশি মাথাব্যথার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাই নে। সাহিত্যে পর্যন্ত তাদের স্থান নেই; তাদের জন্যে সাহিত্য লেখাও হয় না। এখন ভরসা একমাত্র আপনি, কেননা তারা আপনারই ছেলেমেয়ে। বয়স, সমাজ, রীতিনীতি, ট্রাডিশন: এসবের বাধা দূর করে আপনি যদি তাদের মানসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন, গভীর সহানুভূতি ও উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে তাদের সমস্যার সামনাসামনি দাঁড়াতে পারেন, তারা আপনাকে নিকটতম বন্ধু বলে গ্রহণ করবে।

সমাজ এবং মানুষের সামাজিক জীবন যেহেতু সাহিত্যের প্রধান সামগ্রী, সেহেতু যে-কোনও সাহিত্যের প্রামাণিক পরিচয়ের জন্যে যে-সমাজ তার ভিত্তি, তার সম্যক পরিচিতি অপরিহার্য। হাল-কালের যে-সব লেখক 'অসামাজিক' সাহিত্য রচনায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন, অথবা করতে চাইছেন, যাঁরা সমাজের চেয়ে বিক্ষুব্ধ বিদীর্ণ ব্যক্তি-সত্তার ওপর আলোকপাতে প্রয়াসী, তাঁরাও আসলে সমাজকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন, অস্বীকারের প্রাধান্য। প্রেম ও ঘৃণা, স্বীকার ও অস্বীকার একই ভাবানুবেগের বিরোধী প্রকাশ।

বাংলা সাহিত্যের সামাজিক বিশ্লেষণ এখনও অসম্পূর্ণ, বহুলাংশে অকৃত। একদা ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্র সাহিত্যের সামাজিক অনুশীলনে যে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন, উত্তরসূরীরা তার প্রসারে তৎপর হন নি। কিছুদিন আগে অধ্যাপক প্রমথ বিশী বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার উত্তরখণ্ডে এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যা বহুকাল আগেই আমাদের জানা উচিত ছিল: বঙ্কিমই প্রথম সাহিত্যকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এলেন। নাগরিক সমাজের সাহিত্যিক আলেখ্য বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রথম দৃষ্ট হল, এ-কথা ১৯৬৬-তে প্রথম বুঝতে পারা, বা বোঝাতে চাওয়ার মধ্যে সাহিত্য-বিচারের, অনুশীলনের, যে-দারুণ দারিদ্র্য লুক্কায়িত তা আমাদের লজ্জাও দেয় না, এমনই অবস্থা। আসলে, বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনা লেখা হয় প্রধানত কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্যে।

যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জরাগ্রস্ত মহাস্থবির প্রপিতামহ,

অতএব তার দরবারে বর্তমান নামে কোন কাল নেই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে উত্তর তিরিশের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অন্ধ-প্রায় হ'য়েও এই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহাশয়ের হাত থেকে উচ্চতম ডিগ্রী পাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ না হ'লে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কল্কে পাওয়া অসম্ভব; এককালে . প্রপিতামহ শরৎ চাটুজ্যেকে ডক্টরেট দিতে রাজী হন নি। ১৯২০-র পরে যাঁরা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে রূপ রস গন্ধে বাড়িয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেউ প্রপিতামহের স্বীকৃতি পান নি। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ না হ'লেও অননুমোদিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা কর্পোরেশন কিছুতেই আর আমাদের অবাক করতে পারে না, অবাক হবার কারণ হ 'য পশ্চিম বঙ্গের অন্য পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়েও আধুনিক বাংলা সাহিত্য এখনও অপাংক্তেয়।

এর বাইরে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট সমালোচনা কদাপি-কখনও আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু পাঠকমনের ওপর, লেখকদের ওপর, তাদের তাপ পৌষ-অপরাহ্ণের শেষ রোদটুকুর মতই সহজ-সহনীয়।

অথচ বাংলা সাহিত্যের অনেক অনুক্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হয় বঙ্গদেশের সামাজিক, অর্থিক ও রাজনৈতিক চেহারার মধ্যে। বাংলা সাহিত্য-দরবারে বেশি ভাগ নালিশের উত্তর পাওয়া যায় না প্রধানত এ কারণে যে, সাহিত্যকে আমরা সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করি নে।

এ বিচারের অন্তরায় অনেক। প্রথম অন্তরায় হল, আমাদের সামাজিক চেতনার সুদীর্ঘ শৈশব। সমাজ-বিজ্ঞান সবে মাত্র এদেশে স্ফুরিত হতে শুরু করেছে। 'স্যোসাল ষ্টাডি' যাঁরা হাতে নিয়েছেন, তাঁদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট সাহিত্যিকরা বিশেষ পড়েন বলে মনে হয় না; সাধারণ পাঠক তো নয়ই।

দ্বিতীয় অন্তরায়, বাঙালী সাহিত্যিকের কলকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিকতা। ভাষাবিভ্রাটের জন্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সাহিত্যিকরা কোন্ নতুন পথে চলছেন বা চলছেন না, তার সঙ্গে অপরিচয়ের জন্যে তুলনামূলক বিচারের বিরাট লাভ থেকে আমরা বঞ্চিত।

তৃতীয় অন্তরায় হল, বাঙালী সাহিত্যিকের ধারাবাহিক কলকাতা-আশ্রয়ী অস্তিত্ব।

ভাবতে অবাক লাগে একমাত্র অতুলপ্রসাদ ছাড়া অন্য একজনও প্রথম শ্রেণীর বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্গ অথবা বৃহত্তর বঙ্গের বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। আপনারা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করবেন। এঁরা আসলে বৃহত্তর বঙ্গের অধিবাসী। তথাপি লক্ষ্য করে থাকবেন, খাস বাংলার বাইরে থেকে যাঁরাই বঙ্গসাহিত্য রচনায় হাত পাকিয়েছেন, তাঁরাই অন্তত কিছু-না-কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিতে পেরেছেন। 'বনফুল' বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম মহারথী; এমন পরিপূর্ণ কলাকার আমাদের সাহিত্যে বেশি নেই। তবু বনফুলের কাছে আমার একটি বড় নালিশ আছে, এ সুযোগে জানিয়ে রাখি: তাঁর বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ সাহিত্যকৃতির মধ্যে বিহার কোনওদিন বিশেষ স্থান পায় নি। যেমন স্থান পায় নি বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে। অর্থাৎ বিহার-নিবাসী 'বনফুল' কোনওদিন নন, চিরদিন বিহার-প্রবাসী বাঙালী। সতীনাথ ভাদুড়ীই-বোধ করি একমাত্র বাঙালী সাহি-ত্যিক, যাঁর উপন্যাসে বিহার সামগ্রিকতায় পরিস্ফুট। এ বিষয়ে 'একান্তে'র একাধিক পাঠকের মন্তব্য—প্রবন্ধে লক্ষণীয়। আমার ধারণা অতুলপ্রসাদ যদি উপন্যাস লিখতেন, অথবা গল্প, তার মধ্যে আমরা পেতাম তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশকে, এবং তাতে বাংলা

সাহিত্যের আঞ্চলিকতা কিছুটা বিদূরীত হত। এর কারণ, উত্তর-প্রদেশ নিবাসী বাঙালী নিজেকে প্রবাসী মনে করেন না, যেমন এই সেদিনও করতেন, বিহারী বাঙালী। তাঁদের একাত্মীকরণ—আইডেনটিফিকেশন—প্রায় সম্পূর্ণ।

এই আইডেনটিফিকেশন ছাড়া সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। এর জন্যে অবশ্যই শক্তিমান লেখককে দীর্ঘদিন কোথাও বসবাস করতে হয় না। যে আইডেনটিফিকেশন সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য তা দৈহিক নয়, নট ফিজিকাল, বাট ইমোশনাল অর ইনটেলেক্চুয়াল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন সাহিত্যিক সাহিত্যের দিগন্তকে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। মমের গল্পে দুনিয়ার এমন দেশ নেই যার স্থান দেখতে পাবেন না। গ্রাহাম গ্রীন কিউবা এবং ভিয়েৎনাম পরিবেশে উপন্যাস লিখেছেন ; আঁদ্রে মারলো এবং আরও অনেকে চীন নিয়ে। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তুলনা করে দেখুন, বাংলা গল্প-উপন্যাস এখনও কি সাংঘাতিক ভাবে একান্ত বাঙালী এবং অভারতীয়। আমরা বরং সাত-সমুদ্র পেরিয়ে ইংলণ্ডকে পরিবেশ করে উপন্যাস-গল্প লিখব, কিন্তু এই বিরাট মহাদেশ-প্রমাণ ভারতবর্ষের বহুধারা বিচিত্র-বর্ণ জীবন আমাদের সৃষ্টিশীল মনকে উদ্বুদ্ধ করবে না।

শুধু উপন্যাস-গল্প কেন, বাংলা ছায়াচিত্রও কি সংকীর্ণ ভাবে বাঙালী! অন্য কোন প্রদেশের জীবন-আলেখ্য আমাদের ছায়াচিত্রে এখনও অনুপস্থিত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু ছোট গল্পে পুণার টুকরো ছায়া আছে কিন্তু সেও বাঙালী চোখে পুণার খণ্ড ছায়ার বেশি নয়। 'শেমিন' উপন্যাস পড়ে এবং ছায়াচিত্র দেখে আমার মনে হয়েছিল তপন সিংহ কিংবা অসিত সেন কেরলের মৎসজীবীদের জীবন নিয়ে এই ছবি আরও অনেক সুন্দর করে তুলতে পারতেন, এবং তাতে করে

বাংলার সাংস্কৃতিক মানসের সীমারেখাও অনেকখানি প্রসারিত হত। 'শেমিন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সমুদ্র, ছায়াচিত্রে যার সাক্ষাৎ দুর্বল; 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রধান চরিত্র পদ্মানদী; 'গঙ্গা'তে গঙ্গা এত দুর্বল কেন? হিন্দী ছায়াচিত্রে বার বার বাঙালী জীবন প্রতিভাত হয়েছে; কোনও বাঙালী প্রযোজক বা পরিচালক এ পর্যন্ত হিন্দী উপন্যাস বা গল্প নিয়ে ছায়াছবি নির্মাণ করেন নি। ক্ষতি কিন্তু এতে হয়েছে আমাদেরই। অন্তত দুশো বাংলা উপন্যাস অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছেঃ বাংলায় বোধকরি কুড়ি-পঁচিশটি অ-বাংলা উপন্যাসও অনুবাদ করা হয় নি। তাই আপনারা জানেন না, 'শেমিন' কি আশ্চর্য শক্তিশালী উপন্যাস। কেরলে এমন শিক্ষিত ব্যক্তি কম আছেন যিনি 'কপালকুণ্ডলা' কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি'র মালয়ালম অনুবাদ পড়েন নি; অথচ আমরা ক'জন 'শেমিন' পড়েছি, বলুন?

বলতে চাইছিলাম, বাংলা সাহিত্যকে কলকাতা থেকে অনেক দূরে ব'সে খুঁটিয়ে না দেখলে তার আসল চেহারা ঠিক ধরতে পারা যায় না। কলকাতা যেহেতু আমার কর্মস্থল নয়, যেহেতু আমি তাকে জানলেও ভাল ক'রে চিনি না, যেহেতু তার ethos-এ আমি বন্দী নই, যেহেতু ভারতবর্ষ আমার কাছে এক অবিভাজ্য, জীয়ন্ত, প্রতিভাত সাহিত্য-সত্বা, যেহেতু আমার উপন্যাসে বঙ্গদেশ অনুপস্থিত, উপস্থিত বাংলার বাইরের ভারতবর্ষের এক-এক টুকরো অনুভূতি, যেহেতু ভারতবর্ষকে আমি বাঙালী চোখের ওপর ভারতীয় চশমা লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, সেহেতু বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক অনুক্ত অভাব আমার চোখে পড়ে, এবং তার কারণ জানবার আগ্রহ অনুভব করি।

অভাব না বলে 'বৈশিষ্ট্যও' বলতে পারেন। ইংরেজীতে যাকে বলে পিকিউলারিটি। ধরুন, বাংলা উপন্যাসে কলকাতার একচ্ছত্র দাপট। আমাদের উপন্যাসের শতকরা নিরানব্বইটি কলকাতা

নিয়ে। গত কুড়ি বছরে কলকাতা-কেন্দ্রিক নয় এমন উপন্যাস ক'খানা বেরিয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের জীবনধারা কি কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ? একদা ছোটগল্পে বাংলার জিলা ও গ্রাম্যজীবনের বিচিত্র ছবি দেখা যেত, আজকাল গল্পগুলিও বহুলাংশে কলকাতা কেন্দ্রিক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জিলা-শহরের জীবনযাত্রার যে-পরিচয় আমাদের দিয়েছিলেন, তারাশঙ্করের সাহিত্যে বীরভূমকে আমরা যে-ভাবে জানতে পেরেছিলাম, শৈলজানন্দ যে সাহিত্যিক নিষ্ঠার সঙ্গে বিহার অঞ্চলের কয়লাকুঠির ছবি এঁকেছিলেন, মধ্য-শতাব্দীর পরে তা প্রায় অবলুপ্ত। রমাপদ চৌধুরী 'প্রথম প্রহর' লিখে এর মধ্যে আমাদের এক আশ্চর্য আনন্দ-শিহরণ দিয়েছিলেন, যার দ্বিতীয় ও উন্নততর বিকাশ আর ঘটতে দেখলাম না। পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতা ছাড়া আরও তো অনেক শহর আছে: বর্ধমান, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং ইত্যাদি: তাদের সমাজ ও জীবন-চিত্র কেন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত? হাওড়া কিংবা হুগলীর চেহারাও কেন দেখতে পাই না বাংলা উপন্যাসে? আজ যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার জন্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'গবেষণা' করেন অথবা 'মুগল ভারতবর্ষে' ঘুরে বেড়ান, তাঁরা কি দিনাজপুর-দার্জিলিং-বর্ধমান-হুগলী-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরকে বাংলা সাহিত্যের কলকাতা-শাসিত প্রাঙ্গণে একটুও স্থান দিতে পারেন না? তাঁদের এই অমার্জনীয় আলস্যের আশী-র্বাদে কলকাতার বাইরে বাঙালী-জীবন পাঠকের পরিচয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে, অথচ আমরা সবাই জানি পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র কলকাতা নয়, অন্তত তার রাজনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্তারা বেশির ভাগই আসেন কলকাতার বাইরে থেকে।

ভারতবর্ষের আর কোনও সাহিত্য এ-রকম এক-মহানগর-লুপ্ত নয়। মারাঠী সাহিত্যে আপনি গোটা মহারাষ্ট্রকে দেখতে পাবেন—বোম্বাই, পুণা, সুরাট, নাগপুর, বরোদা এবং আরও অনেক শহর,

বহু গ্রাম, সাহিত্যের আসরে উপস্থিত। মালয়ালম সাহিত্যে কেরলের যে-সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তা বোধহয় অতুলনীয়। এ-ক্ষেত্রে একমাত্র মালয়ালম সাহিত্যকেই পশ্চিমের উন্নতমানের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে ঃ জীবনের ব্যাপক ছায়া তাতে দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্য সবে মাত্র শহর-কেন্দ্রিক হতে শুরু করেছে, কিন্তু তাতেও বহু শহরের ছবি দেখতে পাই। তামিল, তেলুগু, উর্দু ও তাই। একমাত্র বাঙালী লেখকের কাছেই কলকাতার 'মিস্টিক্' দুর্ভেদ্য ব্যূহ ঃ অভিমন্যুর মত এ-ব্যূহভেদে সে অসমর্থ।

এ-দুর্ঘটনার কারণ অবশ্য আছে। আজ এক শতাব্দীরও বেশি বঙ্গদেশ অন্ধ ভালবাসায় সব কিছু ঢেলে দিয়েছে কলকাতাকে, মহানগরীকে তৈরী করেছে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র ; বাঙালীর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার ক্ষেত্র। এ অন্ধ প্রেম অবিভক্ত বঙ্গদেশেও বিরাট ভার-অসাম্যের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার বহু দূরে ছিল অনেক উপেক্ষিত বাংলার দ্বিতীয় শহর, ঢাকা। ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে এমন ভাবে একটি শহরকে সর্বাত্মক সম্রাট ক'রে তোলা হয় নি। পুরাতন বোম্বে প্রদেশেও শিল্প-প্রাধান্য ছিল আহ্‌মেদাবাদের, সংস্কৃতিতে পুণার গৌরব ছিল অক্ষত। উত্তর প্রদেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, বারাণসী। মাদ্রাজের সংস্কৃতি-কেন্দ্র তাঞ্জোর, মাদুরাই। একমাত্র বঙ্গদেশেই কলকাতা, কলকাতা, এবং কলকাতা। এর ফলে বাঙালী জীবনে কত রকমের জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে তার হিসেব করাও এখন বেকার। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ কলকাতার পক্ষাঘাতদুষ্ট বাহুশৃঙ্খলে বন্দী। মুক্তির পথ অনাবিষ্কৃত ! মানুষের চাপে, অভাব, সংঘাত, স্থানাভাব, কর্মাভাব, রেষারেষি, দলাদলি, হরতাল, আন্দোলন এবং আরও কত কিছুর চাপে কলকাতার শ্বাসরোধ ; সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেরও।

অবক্ষয়েরও নেশা আছে। এমন ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত বিরল নয় যারা মৃত্যুনিশ্চিত কারবারে অবিরাম অর্থবিনিয়োগ করেন, জেনেও যে, কারবার রক্ষা করা সম্ভব নয়। তেমনি আমরা কলকাতা নিয়েই মেতে আছি, যেমনি আমাদের জীবনযাত্রায় তার চেয়েও বেশি আমাদের সাহিত্যে, একথা জেনেও যে মহানগরীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। তা নইলে রবীন্দ্র ভারতীকেও আমরা কলকাতায় স্থাপন করেছি কেন, বলুন? উন্নয়ন বিষয়ে গত কুড়ি বছরে পশ্চিম-বঙ্গের কর্তৃপক্ষ যেভাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগের, অর্থাৎ কলকাতা-কেন্দ্রিক অঞ্চলের, প্রতি দূরদৃষ্টিহীন পক্ষপাত দেখিয়েছেন তার ফলে পশ্চিম বাংলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে এক নিদারুণ ভার-অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কলকাতা-কেন্দ্রিক অঞ্চলকেই আমরা আমাদের সবটুকু ঢেলে দিয়েছি, অন্যান্য জেলার উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত এখনও অত্যন্ত কৃপণ। অবিশ্যি গত তিন চার বছরে এ অদূরদর্শিতার সামান্য সংশোধন লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতা নামক ব্যাধি, আরোগ্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করে বসেছে।

১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখতে পাই যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জনসংখ্যার ৫৩·৭২ শতাংশ বাস করে প্রেসিডেন্সী বিভাগে। এ বিভাগে আমরা একত্রিত করেছি পশ্চিমবঙ্গের জীবনসম্ভারের অবিশ্বাস্য বহুলাংশ। পশ্চিমবঙ্গে যত হোটেল ও সরাই আছে তার ৫৫ শতাংশ প্রেসিডেন্সী বিভাগে ; তারই সঙ্গে দোকান-পাটের ৫৬ শতাংশ ; ব্যবসায় ও অন্যান্য দপ্তরের ৫৭·৭৪ শতাংশ ; কারখানার ৬৬·৬৫ শতাংশ ; ওয়ার্কশপের ৫৭·১২ শতাংশ ; রেঁস্তোরা ও ভোজনালয়ের ৭০·২১ শতাংশ ; লোকরঞ্জন গৃহের ৫০ শতাংশ ; এবং চিকিৎসা বিদ্যায়তন ও জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৫৭ শতাংশ। পশ্চিম বাংলার নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সবটুকুই প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগে সীমাবদ্ধ। এই দুই

বিভাগে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগকে পেটের দায়ে আমরা একত্রিত করেছি; ফলে অন্য সব জেলার প্রতি নজর দেবার সময় আমাদের হয়নি, হবার সুযোগ ভবিষ্যতেও সীমাবদ্ধ, কেননা গড়ে তোলবার রসদ আমাদের কম, যা আছে তা কলকাতা কেন্দ্রিক অঞ্চলের দাবী মেটাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

মহানগরীর 'মিস্টিক্' বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে গ্রাস করে বসেছে আপনারাও তা অনুভব করেন, যদিও এ নিয়ে তথ্যমূলক আলোচনা আমার বিশেষ চোখে পড়েনি। এ আলোচনা করতে পারেন এমন পণ্ডিত বয়স্কদের মধ্যেও কয়েকজন আছেন, যেমন অধ্যাপক নির্মল বসু। গত বছর সিমলার রাষ্ট্রপতি-নিবাসে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় পরিচালিত Institute of Advanced Studies কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে অধ্যাপক বসু কলকাতা এবং বাংলা দেশের সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে তিনটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা শুনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যিকরা এখনও সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। হ'লে তাঁরা জানতে পারতেন, মহানগরীর মিস্টিক্ বাংলা সাহিত্যে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে; আমাদের স্বভাব এবং অভাব বুঝতে হলে কলকাতার সামাজিক চেহারা ও তার বিবর্তন অনুশীলন অপরিহার্য। এসব সমস্যার কয়েকটি আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়, যেমন ধরুন, বাংলা সাহিত্যে বেশ্যার প্রাদুর্ভাব, এবং বাংলা উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্রের একাকীত্ব। আপনারা যাঁরা বাংলা উপন্যাস পড়েন, আপনাদের কি কখনও মনে হয়েছে যে আমাদের উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকারা প্রধানতঃ লোনলি? আমি জানি যে মার্কিন সাহিত্যে loneliness নিয়ে সমালোচকগণ অনেক আলোচনা করেছেন; বাংলা সাহিত্যেও যে এই ধরনের আলোচনার সুযোগ রয়েছে, তা কি আপনদের মনে হয়েছে?

আপাততঃ কলকাতা-কেন্দ্রিকতার জন্য আমাদের সাহিত্যে

আরও কত অভাবের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা আর একটু বলি। বাঙালীর জীবনের সম্যক পরিচয়ই যে শুধু আমরা পাই নি তা নয়; বাংলা দেশের অনেকখানিই আমাদের অগোচর থেকে গেছে শুধু তাই নয়; মধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃতিও বড় একটা ঘটে উঠতে পারেনি।

ভেবে দেখুন, গ্রামীন জীবন নিয়ে কত অল্প সংখ্যক উপন্যাস বাংলায় লেখা হয়েছে। কলকাতার বাইরে গ্রামীন পরিবেশে যে বিদগ্ধ উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। কিন্তু এ পথে গত কুড়ি বছরে অন্য কোন বলিষ্ঠ লেখক পা বাড়ান নি। ফলে বাংলার চাষী এবং গ্রামীন মানুষ সাহিত্যের আসরে এখনও কল্কে পায় নি। একদা তারাশঙ্কর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালী লেখক তাকে এগিয়ে নিয়ে যান নি।

তেমনি, শিল্পে-কারখানায় ভারতবর্ষে প্রধানপ্রায় স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও, শ্রমিক জীবন এখনও আমাদের সাহিত্যে অনায়ত্ত। পঞ্চাশ দশকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বার্নপুর-আসানসোলের ইস্পাৎ-শ্রমিকদের ধর্মঘট কেন্দ্র করে একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেছিলেন; কিছু কিছু সাহিত্যিক পদস্খলন সত্ত্বেও "ইস্পাতের স্বাক্ষর" যথেষ্ট সম্ভাবনার সূচনা করেছিল। কিন্তু তারপর আমাদের আর কেউ ও-পথে পা বাড়ান নি।

শ্রমিক জীবনের আলেখ্য সাহিত্যে আনতে হলেই বিশেষ কোনও 'ইজ্‌মে'র পাণিগ্রহণ করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বরং দেখা গেছে 'ইজম' সাহিত্যের পরিপন্থী; অমন যে বিরাট প্রতিভাধর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও কম্যুনিষ্ট হবার পরে আর উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখতে পারেন নি। শৈলজানন্দের শ্রমিক-আলেখ্য অনেকাংশে রোমান্টিক ছিল, তাহলেও তিনি একদা এক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্ত অনেকখানি প্রসারিত করেছিলেন।

এ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রসারিত দিগন্ত স্বাধীনতা-উত্তর লেখকগণ সংকুচিত ক'রে প্রধানত তাকে কলকাতা-কেন্দ্রিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্যে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-সাহিত্যিক কৃষাণ-শ্রমিক জীবনের শরিক, তাঁকে নতুন সাহিত্য তৈরীর আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহ্বান এখন অশ্রুত। আমার ধারণা পরবর্তীকালের পাঠক ও লেখকরা যখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের বাংলা সাহিত্যের দিকে নির্দয় দৃষ্টিপাত করবেন, আমাদের মননের দারিদ্র্য, প্রয়াসের স্বল্পতা, উদ্যমের অভাব ও সাহসের সংকীর্ণতা তাঁদের কাছে নগ্ন ধরা পড়বে। দেশকালপাত্রে বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির বিশ-ত্রিশ বছর কেবল স্বল্পসন্তুষ্টিতে এবং নিজেদের ছোট-পকেট-পূর্তিতে কাটিয়ে দেবার অপরাধ পরবর্তী যুগের বাঙালী সহজে ক্ষমা করবেন না।

সাহিত্যের সম্মান

স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন না হলে সামাজিক সম্মান নেই। সমাজ-মান, সোস্থাল স্টাটাস, নির্ণয়ের দুই প্রধান মাপকাঠি বর্তমান ভারতীয় সমাজে ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত বিত্ত। ইংরেজীতে বললে অর্থটা বোধহয় আর একটু পরিষ্কার হবে ঃ পলিটিক্যাল পাওয়ার এবং পার্সোনাল অফ্লুয়েন্‌স্।

মন্ত্রীজাতীয় মহোদয়দের ছাড়া আমাদের কোনও সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নয়; তাঁরা পার্মানেণ্ট চীফ্ গেস্ট, অথবা সভাপতি। নিমন্ত্রণ পত্রে আমরা লিখে থাকি ঃ অমুক মন্ত্রী হ্যাজ ভেরী কাইন্‌ড্‌লি কনসেন্‌টেড টু গ্রেস দ' অকেজন, একথা জেনেও যে তিনি এ স্বীকৃতি-সম্মানের জন্যে উদগ্রীব অপেক্ষমান, অথবা আমন্ত্রণ পেলেই হাজির।

অর্থ ও ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা আমাদের সমাজে অন্ত্যজ। রাষ্ট্রীয় সম্মানে বছরে দুতিনবার যাঁদের ভূষিত করা হয়, এ সম্মান কিন্তু তাঁদের অঙ্গের ভূষণ হ'য়ে শোভা পায় না। সম্মানিত ব্যক্তিরা নামের সঙ্গে পদ্মবিভূষণ বা পদ্মভূষণ বা পদ্মশ্রী যোগ করেন না, কেবল এ জন্যে যে, এ জাতীয় খেতাব বয়ে বেড়াবার মধ্যে আত্মপ্রীতি যদি বা থাকে, জনস্বীকৃতি সামান্য। অতএব, আইনত মৃত হ'লেও ইংরেজী আমলের নাইটহুড এখনও আমাদের কাছে বিরাট সম্মান; একমাত্র সরকারী দলিল ছাড়া, তার স্বীকৃতি সর্বত্র। কে. টি-দের সংখ্যা বর্তমানে মুষ্টিমেয়; যে-কয় জন আছেন, তাঁরা নিজেরা নামের আগে গর্বের সঙ্গে 'স্যার' ব্যবহার করেন, অন্যরাও সসম্মানে তা স্বীকার করে নেয়। স্যার বীরেন মুখার্জি এবং লেডী রাণু মুখার্জি

এখনও সরবে সর্বত্র "স্যার" এবং "লেডী"; যেমন আছেন স্যার সি. ভি. রমণ। অথচ সত্যেন বোস কি কদাপি নিজেকে পদ্মবিভূষণ ব'লে পরিচয় দেবেন? যাঁদের হাতে বলশালী সংবাদপত্র আছে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মান, কিছুদিন, কোনও না কোনও উপায়ে জনসাধারণের গোচরে রাখা হয়। আমরা নিরুত্তাপ কৌতুক ছাড়া আর কিছু অনুভব করি নে। ঈশ্বর জানেন, ঈর্ষাও নয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে অবস্থা আরও পাণ্ডুর। বছরে একবার সম্মান বিতরণ করেন সাহিত্য আকাদমী। ভাণ্ডার তাঁর সামান্য, ভারতবর্ষে স্বীকৃত ভাষা সংখ্যা পনের, সুতরাং প্রতি ভাষায় বছরের সম্মানিত সাহিত্যিককে পাঁচ হাজার টাকার বেশি দেওয়া যায় না। যে দেশে আর্থিক প্রযত্নে প্রতিদিন তের কোটি টাকা ব্যয় হচ্চে—চতুর্থ যোজনার ডেভেল্পমেন্ট খাতে এ-পরিমাণ ব্যয় নির্দেশিত—সে-দেশে এক এক ভাষার প্রধান সাহিত্যিককে বছরে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার মধ্যে যে মনোভাব প্রচ্ছন্ন তাতে ব্যুরোক্রেসী ও রাজনৈতিক নেতাদের সাহিত্য-স্বীকৃতি সুপ্রভাস। টাকার পরিমাণ আসল নয়, আসল হল সম্মান: এ ধরনের কথামৃত গান্ধী-যুগে যদি বা চলত, বর্তমান ভারতে একেবারে অচল, কেননা, আগেই বলেছি, আমাদের সমাজ একমাত্র চেনে টাকা ও ক্ষমতা।

সাহিত্য আকাদমী ছাড়াও কলকাতায় সাহিত্যিকদের সম্মান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাৎসরিক রবীন্দ্র পুরস্কার। সংবাৎসরিক বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে মনীষা-বরণ। আনন্দ পুরস্কার, অমৃত পুরস্কার, উল্টোরথ পুরস্কার। এই তিনটি পুরস্কারের অংক, আমার মনে হয় অত্যন্ত কৃপণ: বিশেষ ক'রে প্রথম দুটির, দাতারা যেহেতু বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান। উভয় পত্রিকা প্রতি বছর প্রেস ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াকে পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা দেন। তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়কে দিল্লী আসতে হলে, আন্দাজ করি, একদিনে পথ খরচ ও পথ্য খরচে হাজার টাকা ব্যয় করতে

হয়। আনন্দ ও অমৃত পুরস্কারের অংক যদি দাতাদের লজ্জা না দেয়, তা শুধু এ কারণে যে গ্রহীতারা এ নিয়ে লজ্জা পান না।

সাহিত্য আকাদমীর বাৎসরিক সম্মান বিতরণ যে আমাদের তেমন উৎসাহিত করে না, তার কারণ অনেক। প্রথমত, বিচারের কোনও সুস্পষ্ট মাপ-কাঠি নেই। প্রতি বছর ঘোষিত সম্মান তিন বছরের প্রকাশিত সাহিত্যকৃতির ওপর ; অতএব পাঠক মনের সঙ্গে সম্মানিত পুস্তকের যোগাযোগ বিঘ্নিত হ'তে বাধ্য। সম্মানের জন্যে সাহিত্যিকের সমস্ত সৃষ্টি এবং তার সম্যক প্রভাব বিচার করে দেখবার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এপর্যন্ত যে সাহিত্যিকগণ, সাহিত্য রচনায় পরিণত সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদেরই দাবী আদৌ মেটান সম্ভব হয় নি। সিনিকরা বলেন, সাহিত্য আকাদমী রিটায়ার্ড লেখকদের গলায় গাঁদার মালা পরাচ্ছেন। কিন্তু এ নীতিও সর্বত্র অনুসৃত হয় নি, কেননা গজেন্দ্র মিত্তির সুলেখক হলেও, কয়েকখানি সুখপাঠ্য এবং কখনও-সখন প্রতিভার-ঝিলিক-মারা উপন্যাস লিখলেও, একমাত্র স্তাবক ছাড়া কেউ বলবেন না যে বাংলা উপন্যাস বা কথা-সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী প্রভাব পড়েছে। অর্থাৎ বর্তমান কালের বাংলা কথা-সাহিত্যে আকাদমী-সম্মানিত তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর, এবং কাব্য-সাহিত্যে প্রেমেন মিত্র, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীর যে স্থান, গজেনবাবুর তা নয়। এই এত বছরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্মানিত ক'রে আকাদমী একদিকে অপেক্ষাকৃত নতুন লেখার প্রতি তাঁদের সচেতন মনোযোগের প্রমাণ দিয়েছেন, অন্যদিকে দেখিয়েছেন যে সাহিত্য-বিচারে তাঁরা সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতবাদের পরোয়া করেন না। আকাদমী নিশ্চয় জানেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ১৯৬৫ সালে সম্মানিত ক'রে তাঁরা সাহিত্যপ্রেমীদের মনে যে পুলক সঞ্চারে সমর্থ হ'য়েছিলেন, তাঁদের অন্যান্য বছরের সিদ্ধান্ত তা অর্জন করতে পারে নি। বিষ্ণু দে-র কবি-প্রতিভা অনস্বীকার্য, তথাপি, মানতে হবে, তিনি প্রায়

রিটায়ার্ড ; বরং, তুলনায়, বুদ্ধদেব বসু এখনও প্র্যাক্‌টিসিং পোয়েট এবং অতিশয় সজাগ, তীক্ষ্ণ, সৃষ্টিশীল কবি, অথচ সাহিত্য আকাদমী এখনও তাঁকে সম্মানিত করেন নি। বনফুল এখনও আকাদমি পুরস্কার পান নি, ভাবতে পারেন ? মহাযুদ্ধের যুগে আরম্ভ ক'রে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে যাঁদের সাহিত্যকৃতি পরিণতি লাভ করেছে, অর্থাৎ গত ২০।২৫ বছরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামক এক কম্যুনিষ্ট কবি ছাড়া একজনও বাংলাদেশে সাহিত্য আকাদমীর সম্মান লাভ করেন নি। যেমন রাজনীতিতে বৃদ্ধের মায়াজালে জড়িয়ে আমাদের সৃষ্টিশীলতা পঙ্গু, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে।

সাহিত্য আকাদমী ঘোষিত সম্মানকে আমরা কি চোখে দেখি তার জলন্ত প্রমাণ সম্মানিত সাহিত্যিকের প্রতি পত্র-পত্রিকাগুলির অশোভন ঔদাসীন্য। আকাদমীর বিচার-মান যাই হোক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সম্মান সাহিত্য-ক্ষেত্রে বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। ভারতীয় বিদ্যাপীঠ-কর্তৃক সম্প্রতি প্রবর্তিত লক্ষ টাকা পুরস্কার সাহিত্য-কর্মীদের-মধ্যে ঈর্ষার প্রবাহ বইয়েছে মাত্র, সৃষ্টিশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। ১৯৬৭ সালে তারাশঙ্করকে তাঁর অল্পকালের রচনা 'গণদেবতা'র জন্যে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবার মধ্যে যদি-বা কোন ব্যঙ্গ লুকান থাকে, বিদ্যাপীঠের বৃদ্ধ পণ্ডিতরা তাতে একেবারেই দায়ী নন। গণদেবতায়, যতদূর মনে পড়ছে, কার্ল মার্কস্ নামক এক ভদ্রলোকের প্রতি আদর্শগত আনুগত্য ছিল। বিদ্যাপীঠ পুরস্কার যদি প্রাইভেট অগ্রসর ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমার সিদ্ধান্ত ক'রে থাকেন, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে দীর্ঘ বিলম্ব হ'তে বাধ্য, অতএব ঋষি তারা-শঙ্করের এই সম্মানে, তাঁর বৈরাগ্য সত্ত্বেও, আমরা সবাই ঈর্ষিত গৌরব অনুভব করতে পারি ; ওদিকে পুরস্কারের প্রথম দুবছরে হিন্দী সাহিত্যকে উপেক্ষা করার অপরাধে বিদ্যাপীঠকে কি সমস্যার

সম্মুখীন হ'তে হয় তা লক্ষণীয়। অথচ আজ পর্যন্ত সম্মানিত সাহিত্যিক কিম্বা তাঁদের বই নিয়ে কোনও বিস্তৃত আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি। 'পদ্মভূষণ' সম্মান পেয়ে শ্রীঅশোক কুমার সরকার আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যে পরিমাণ স্বীকৃতি পেয়েছেন, মনোজ বসু তার তুলনায় পেলেন কতোটুকু? 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামে যে ব্যক্তি 'দেশ' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য আলোচনার অঙ্গভঙ্গী করেন, তাঁর কলমে এ বছরের সম্মানিত বঙ্গ সাহিত্যিক সম্বন্ধে শ তিনেক শব্দের বেশি কথা জুটল না। অন্তত এ মৌকায় বাংলা কথাসাহিত্যে মনোজ বসুর কি অবদান, অথবা উল্লেখযোগ্য কোনও অবদান আদৌ আছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা প্রত্যাশা করা পাঠকদের পক্ষে অন্যায় নয়। তেমনি 'নিশিকুটুম্ব' কি ধরনের উপন্যাস, সম্মানের যোগ্যতা তার আছে কি না, কোথায় তার ঔৎকর্ষ এবং কোথায় তার অবক্ষয়, তারও কি কোনও হদিশ আমরা পেলাম? আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না কি ক'রে একটি সাহিত্য পত্রিকা বছরের সম্মানিত সাহিত্যিক নিয়ে হয় নীরব অথবা দু চারটি মামুলী কথায় আত্মতুষ্ট। অথচ কেবল 'দেশ' কেন, একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায়ও কি মনোজ বসুর গল্প উপন্যাস, বিশেষ ক'রে, 'নিশিকুটুম্ব' নিয়ে আলোচনা দেখতে পেয়েছেন, কিম্বা পাবেন!

অগত্যা আকাদমী পুরস্কারের অলংকার প্রকাশককে বিজ্ঞাপনের জন্যেই বার বার ব্যবহার করতে হয়, যা নাকি মনোজ বসুর ক্ষেত্রে বিড়ম্বনাদায়ক, কেন না তিনি নিজেই নিজের বইএর প্রকাশক। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আকাদমী সম্মানিত সাহিত্যিক সম্বন্ধে এই সমবেত ঔদাসীন্য না আছে হিন্দীতে, না মালয়ালমে, না তামিল-মারাঠায়, এ কেবল বাঙ্গালী জীবনের ভূষণ। আজ মনোজ বসুকে নিয়ে যা ঘটছে না, গত বছর বিষ্ণু দে-কে নিয়ে তা ঘটে নি; তার আগের বছর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়েও নয়।

এর কারণ একাধিক—সব চেয়ে বড় কারণ, চলতি লেখা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনার জন্যে যে পরিশ্রম প্রয়োজন, তার জন্যে পত্রিকার লেখকরা তৈরী নন; এবং, সমালোচনা করতে গিয়ে প্রশংসা জ্ঞাপনে তাঁদের অনুদার শ্রদ্ধাহীন মন সংকুচিত, নিন্দা করার মতো সৎসাহসের অভাব। বাংলা পত্রিকায় সাহিত্য-আলোচনার নামে যা ছাপা হয়, বিলিতি ও মার্কিন সাময়িক পত্রিকাগুলি যাঁরা পড়েন, তাঁরা জানেন, কোথা থেকে তার বেশির ভাগ কত অনায়াসে গৃহীত হয়ে থাকে।

এতগুলো কথা বলার পর পাঠক নিশ্চয় আশা করবেন, মনোজ বসু ও 'নিশিকুটুম্ব' সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করি। এ কার্যে আমার যোগ্যতার অভাব, আমি মনোজ বসুর সব বই পড়ি নি। তা হলেও আমি জানি, মনোজ বসুর সাহিত্যকৃতি উপেক্ষণীয় নয়। একে তো এ কৃতির ব্যাপকতা সুদীর্ঘ, তা ছাড়া বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত তাঁর হাতে নিশ্চয় কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। আসলে মনোজ বসু ট্র্যাডিশনাল রাইটার—উচ্ছ্বাস, আবেগ, রোমান্স তাঁর আসল রসদ, কিন্তু তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম, অতএব আনন্দ-শিহর। 'ভুলি নাই' আমরা আজও ভুলি নি, বহুদিন ভুলব না। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সব খণ্ড ছবি মনোজ বসুর গল্প-উপন্যাসে প্রতিভাত, তা পুরো মাত্রায় রোমান্টিক হলেও আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার বলে আকর্ষণীয়। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মত মনোজ বসুর রচনা ও বিষয়-বস্তু, আঙ্গিক ও চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট : অতি-রচনার অনিবার্য ফল। তা হলেও কিছু অনবদ্য সৃষ্টি তাঁর হাতে সম্ভব হয়েছে। এ বিশ্লেষণে আমি 'নিশিকুটুম্ব'-কে বিজ্ঞাপিত করব না; আমার মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, এর চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ হল 'বন কেটে বসত' ও 'মানুষ গড়ার কারিগর'। দুখানাকেই আমি উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলব। 'বন কেটে বসতে' জীবনের বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দীপ্যমান; 'মানুষ গড়ার কারিগর' বর্তমান

ভারতীয় জীবনের নিপুণ আলেখ্য। 'নিশিকুটুম্ব' বিষয়বস্তুতে নতুন, এর প্রধান চরিত্রগুলি নিশিচর চোর, এবং সংস্কৃত পণ্ডিতগণ চৌর্যবৃত্তি নিয়ে যে-সব চর্চা ক'রে একে একটা প্রফেসনের পর্যায়ে তুলেছিলেন, তা নিয়ে মনোজ বসু গবেষণার পরিচয়ও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আসল চরিত্রটি ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষ হয় নি, খানিকটা রবিনহুড জাতীয়, সহানুভূতি এমন কি "শ্রদ্ধারও যোগ্য" তস্কর হয়ে উঠেছে। এ সব সত্ত্বেও 'নিশিকুটুম্ব' মাঝে মাঝে ঝিলিক-মারা উপন্যাস; কিছু কিছু পার্শ্বচরিত্র অনবদ্য।

এ বছরের আকাদমী সম্মানিত সাহিত্যিকের সমগ্র সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে তিনটে মোদ্দা কথা বোধকরি বলা যেতে পারে। ১৯৪৫—৬৫ সালের বাংলা উপন্যাস সাহিত্য যেদিন বিচার-বিশ্লেষিত হবে, মনোজ বসুর উপন্যাস বাদ দেওয়া চলবে না, ছোট গল্প এবং 'মিনি-উপন্যাস' তো নয়ই। অর্থাৎ এ পঁচিশ বছরের প্রসারমান কথা-সাহিত্যে তিনি নিজস্ব একটি স্থান অধিকার করে রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, ট্রাডিশনাল রাইটার হয়েও বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন চরিত্র, সংঘাত, আঙ্গিক তিনি অবশ্যই এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে একটি অনবদ্য আন্তরিকতার আবহ-সঙ্গীত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তৃতীয়ত, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষা মনোজ বসুর হাতে তীক্ষ্ণতা ও অর্থপূর্ণতা অর্জন করেছে। সরল সহজ কথ্যভাষার এমন সুচারু সুতীক্ষ্ণ ব্যবহার কম সাহিত্যিকই করতে পেরেছেন। আবেগের আধিক্য অবশ্য বর্তমান, তথাপি তাঁর ভাষায় অচিন্ত্য-কুমারের সচেতন 'কায়দা' নেই, বিদ্যার কচকচি নেই, ব্যাকরণ কেবল শুদ্ধ নয়, বাক্যরচনায় অসাধারণ নৈপুণ্য। মনোজ বসুর নিজস্ব ষ্টাইল আছে, যা আমাদের কালের মহারথীদের অনেকের নেই, তাঁদের গদ্য দুষ্পাঠ্য, পীড়াদায়ক। এ কালে যাঁরা মোটা মোটা বই লেখেন, মনোজ বসুর গদ্য তাদের অনেকের আয়ত্বের বাইরে।

সর্বসাকুলে, অতএব, মনোজ বসুর আকাদমী সম্মান পাওয়া

আমি সমর্থন করি—যদি এ নীতি মানতে হয় যে, এ সম্মান অন্তত উপন্যাস ক্ষেত্রে তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরা অবসর নেবার বয়স পার হয়েও নেন নি, কারণ এদেশে অবসর নেওয়াটা রীতি নয়। 'নিশিকুটুম্ব'কে আমি সম্মানিত হবার মত উপন্যাস বলে মানতে রাজী নই।

সাহিত্য আকাদমী আমার কথায় কর্ণপাত করবেন না। না করবেন তাঁরা, যাঁরা প্রতিবছর আকাদমীকে পরামর্শ দেন। তবু বলে রাখি, ১৯৬৮ সালে সমরেশ বসু সম্মানিত হলে আমি বলব আকাদমী ঠিক কাজ করেছেন। যদি পুরতনদেরই গলায় গলায় মালা পরাতে হয়, আকাদমী কি বুদ্ধদেব বসুর নাম জানেন না?

* * *

পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবার সফল হতে চলেছে। পাঠকদের কিছু কিছু চিঠি আমার হাতে এসেছে। নিউ দিল্লীর পি-২ হাউজখাস এনক্লেভ থেকে শ্রীঅনিরুদ্ধ চৌধুরী দুখানা মননশীল পত্র লিখেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্র অধিকতর উল্লেখযোগ্য একারণে যে তিনি আমার কিছু কিছু মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন। 'শেমিন' উপন্যাস সম্বন্ধে আমার প্রশংসা তাঁর কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়েছে, যদিও তিনি ডাঃ নারায়ণ মেননের ইংরেজী অনুবাদকে 'অনবদ্য' আখ্যা দিয়েছেন, এবং প্রশ্ন করেছেন, 'কোনও বাংলা উপন্যাসের এত চমৎকার অনুবাদ কি আছে? উত্তর দিয়েছেন নিজেই: 'নেই বোধহয়, করবেটা কে?' অনিরুদ্ধ চৌধুরী 'শেমিন' উপন্যাসের পটভূমিকায় বৈচিত্র্য দেখতে পান নি; আসলে, পটভূমিকার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না; 'আমরা উপন্যাসের ভালো-মন্দ বিচার করি তার পটভূমিকার জন্যে নয়। তার শিল্পগত ঔৎকর্ষের জন্যে। তাঁর চিরায়ত মানবিক আবেদনের জন্যে।' 'শেমিনের' প্লট তিনি 'জোলো' মনে করেন: 'চাপ চাপ

সেন্টিমেণ্ট আর রোমান্টিসিজমে ভরা।' অনিরুদ্ধবাবুর এ-বিচারের সঙ্গে আমি যে একমত নই তা তিনি এবং আপনারা জানেন। আমার কাছে 'শেমিন' বিশেষ শক্তিশালী উপন্যাস ব'লে মনে হয়েছে, প্রধানত এ কারণে যে, চরিত্রগুলির মধ্যে আমি কিছুটা সামুদ্রিক এলিমেণ্ট দেখতে পেয়েছি, কৃত্রিমতা চোখে প'ড়ে নি, চাপ চাপ যদি-বা থাকে ঢাক-ঢাক বিশেষ কিছু নেই, এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ও ব্যঞ্জনার আশ্চর্য স্বল্পাভাষ রয়েছে। অনিরুদ্ধবাবু উপন্যাসের পরিবেশ সম্বন্ধে যে-কথা তুলেছেন তা ঠিক, এবং ঠিক নয়। আমি বাংলা উপন্যাসের পরিবেশ-দারিদ্র্যের কথা তুলেছিলাম প্রধানত দেখাতে যে বাংলা দেশের, বাঙালী সমাজের অনেকখানিই, এবং ভারতবর্ষের প্রায় সবটাই, আমাদের সাহিত্যের এখনও বাইরে রয়ে গেছে ; এ অভিযোগের সঙ্গে শ্রীচৌধুরী বোধহয় অন্যমত নন। যদি মেনেও নি, সাহিত্যের বিচার আসলে শিল্পের উৎকর্ষ দিয়ে যাচাই করতে হবে, তবু একথা রয়ে যায় যে মানুষের যে বিচিত্র বিকাশ, জীবনের যে বিচিত্র বিন্যাস সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে ও পটভূমিকায়, তার ব্যাপক পরিচয় বঙ্গসাহিত্যে এখনও আমরা পাই নি, যদিও এক্ষেত্রে হালকালের অনেক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। অনিরুদ্ধবাবু গতবারের 'একান্তে'-র একটি উল্লেখযোগ্য বিস্মৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিহারী সমাজের চিত্র 'বনফুল' আমাদের যদিও দেন নি, সতীনাথ ভাদুড়ী নিশ্চয় দিয়েছেন। অনিরুদ্ধবাবু ঠিকই বলেছেন : "তাঁর 'ঢোঁড়াই চরিতে'র ঢোঁড়াই তো আমাদেরই লোক হ'য়ে গেছে।"

অনিরুদ্ধ চৌধুরীর প্রথম পত্রটির মধ্যে সুস্থ জ্বালা আছে—পাঠকের নালিশ লেখকের বিরুদ্ধে। এর কিছুটা আপনাদের কাছে পেশ করছি—

"আপনার 'একান্তে'র জন্য নিয়মিত উল্টোরথ পড়তে হয়। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান বাংলা সমাজ, সাহিত্য ও বাঙালীর প্রতি

আপনি একটা নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেন বলেই ঐ আলোচনার উপস্থাপনা।...

"বাংলা সাহিত্য যুগে যুগেই কিছু 'সাবালক-নাবালক' লেখক দের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। এবং তাদের অপূর্ব, অনন্য সৃজনীর চাটনীতে মানসিক রসনার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে। এককালে পাঁচকড়ি দে, দীনেন রায়, সর্বজ্ঞ শশধর দত্ত বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট-অংশ পাঠকের মানসিক শৈশবের ফিডিং বোটলের কাজ করেছেন! যুগ পাল্টেছে। সাহিত্যে স্যাচুরিটি এসেছে কি না এসেছে, জানা নেই। তবে পাঠক কিঞ্চিৎ কিশোরত্ব অর্জন করেছে। নীল-বসনা, রবার্ট ব্লেকের মোহন-বাঁশির সুর কেটে গিয়ে সেখানে বেজেছে অন্য সুর।

"নিয়মের রাজত্বে কিচ্ছুটি ভ্যাকুয়াম পড়ে থাকার জো নেই। তাই সে জায়গাগুলোয় এসেছেন জরাসন্ধ, বিমল মিত্তির, শংকর, নীহার গুপ্তেরা। লেখকেরা চিরদিনই পাঠকদের 'লম্বকর্ণ' অথবা সিম্পলটন মনে করে এসেছেন। এবং সামান্য কিছু ব্যতিক্রম নজির ছাড়া, সকলেই সেই হিসেবে ষ্টক ছেড়েছেন। যাঁরা জিতেছেন তাঁরা গোপনে হেসেছেন। আর হতভাগ্য ভ্যান্‌কুইশড্ এর দল (সংখ্যায় ভারি যারা) অনায়াসে বলেছেন, 'পাঠকরা এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আসতে পারল না।'

"কিন্তু পাঠক? হাবাগোবা, অতি সরল তারা। ঠকা তাদের কোষ্ঠিতে লেখা। তবু, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভেজাল মাল কিনে তারা এত বেশি ঠকছিল যে, সোজাসুজি ভেজালই তারা নিতে শিখে গেল। কাহাতক আর কেক্ জেনে নেড়ে-বিস্কুট চিবোনো যায়। বিমল মিত্তির, জরাসন্ধ, বারীন দাস অমরেন্দ্র দাসেরা আর কিছু না পারুক পাঠকদের ধোঁকা দেয় না। ছোটবেলার 'ঠাকুমার ঝুলি', আমাদের রক্তে আজও প্রবহমান। তাই খুশি হয়ে আমরা 'ন্যায়দণ্ড', 'চৌরঙ্গী', 'চার চোখের খেলা' আর 'বাতাসী মঞ্জিল' পড়ি।

"আসলে আমাদের বাংলা-সাহিত্যের লেখকেরা কোনদিনই পাঠক তৈরি করতে চাননি। তাই তা বহুধা-বিভক্ত। একই পাঠক এক সঙ্গে নীহার গুপ্ত, বিমল কর বা সাহিত্যের-ইতিহাস পড়ছে, এই বস্তু তাই দুর্লভ। সকলে এক আকর্ষণ নিয়ে পড়তে পারে এমন বই তো আমি শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া কাউকে লিখতে দেখি না। ভারি-পদার্থঅলা লেখায় একটু 'তেমন-তুমন' রস না থাকলে পাঠকরা তা সহজে পড়তে চায় না। হয় রূপকথা নয় সেক্স। বর্তমান সমস্যা-জর্জরিত বাঙালী পাঠকদের তাই চূড়ান্ত এক্সপ্লয়েট করছে আজকের সাহিত্য।

"রোগী জেনেও তাদের ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়াচ্ছেন লেখকেরা।

"আপনি বলেছেন যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শক্তিমানদের আনাগোনা নেই কেন। যদি উপন্যাসের প্রসঙ্গে আসেন তাহলে বলব যে সেখানের বাজারে 'দাগী' ছাড়া অন্যেরা যারা কল্কে পায়, তারা হাতে-পায়ে-ধরা একদল ফড়ে। আর প্রতিভা দলে দলে দেখা যায় না একথা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়। আজকে কোন পত্রিকারই বেঁচে থাকাটা একটা সমস্যা। তার মাধ্যমে সাহিত্যিক গড়া বা দল গড়া (কল্লোল-কালিকলম) তো অসম্ভবই প্রায়। আপনি নিশ্চয়ই ছোট ছোট পত্রিকা পড়েন না। পড়লে নিশ্চয়ই বুঝতেন যে, আসলে শক্তিমান সাহিত্যিকের অভাব নেই। অভাব যা তা পৃষ্ঠপোষকতার। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের 'বড়-বাজার' যারা কন্ট্রোল করছে তারা 'চির-হরিত' থিয়োরীতেই বিশ্বাসী। এবং তাদের বাজারে যারা প্রোডাক্ট পাঠায় তারাও পুরনো আমলের একান্ত বিশ্বাস্য বা বিশ্বস্ত লেখক। বড়-বাজার জানে ঐ লেখকেরা চমৎকার স্লিপিং পিল, তার চেয়েও, চমৎকার দ্রুততায় ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে। আর কোন যুগেই প্রবীণেরা সহজে নতুনদের পথ ছেড়ে দেয় না। তাই একথা বলতে

পারেন যে শক্তিমানরা আছেন ঠিকই, কিন্তু তারা পথের সংগ্রাম করছেন।"

জয়পুরের ৫, মীর্জা ইসমাইল রোড থেকে পত্র লিখেছেন হিমাদ্রিশেখর রায়। তাঁর প্রধান বক্তব্য সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে; দেখিয়েছেন, চলতি সাহিত্যের সমালোচনা বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে এখনও সত্যিকারের শুরু হয় নি। পত্রের কিছুটা উল্লেখ করছি:

'একান্তে'র কোন আলোচনাই আমি উত্তেজিত না হয়ে পড়ে শেষ করতে পারিনি। বাংলা সাহিত্যে ও সাহিত্যিকদের চরিত্রে যে দূষিত ব্যাধিগুলি কয়েক দশক চৌকপীপাট্টা গেড়ে বসেছে তা নিরাময়ের জন্যে আপনার একক প্রচেষ্টা অত্যন্ত উদ্দীপক। এত দীর্ঘকালের একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে নিরাময় করার প্রচেষ্টা সে কারণেই উত্তেজক। আপনার ব্রত, আমার বিশ্বাস, ক্রমশঃ সাধু ও সুধীজনদের এই পৌনঃপুনিক ভ্রষ্টাচার থেকে বিরত করতে চেষ্টা করবে। অবশ্য ততদিনে আপনার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটলে।

ধৈর্যের প্রশ্নটা আনার কারণ আছে। বেশ কয়েক যুগ ধরে যে ক্লীবত্ব সাহিত্যের সকল সংশ্লিষ্ট মহলে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা এক বছর বা দু বছরের সম্মার্জনায় দূর হবার নয়।

একটি বিষয়ে কিঞ্চিত প্রাঞ্জল হবার বাসনাতেই এই বিশদ ভূমিকা। Past is always golden এই নীতিতে আপনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। অন্য সব দিকের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে (আপনার যে মতগুলোতে আমাদের খটকা লেগেছে) চিঠিটা বিরক্তিকর ভাবে বড় হয়ে যাবে। তা পড়ার সময়ের অভাব আপনার যেমন আছে, লেখার ব্যাপারে আমিও সেই সময়ের অভাব বোধ করি। আমি সমালোচনা প্রসঙ্গটি তুলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশের আগে পর্যন্ত সমালোচনায় বিব্রত ছিলেন

এবং সেকালে কিছু বিদগ্ধ আলোচনা হত এ রকম প্রচ্ছন্ন একটা আভাষ আপনার শেষের লেখায় রয়েছে। এখানেই কিছু বলার সুযোগ আছে।

আমাদের মনে হয়, এবং মনে হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে, বাংলায় কেন ভারতবর্ষে কোন সাহিত্যেই এ পর্যন্ত সমালোচনা (অভিধানিক অর্থে) হয়নি। রবীন্দ্রনাথের লেখারও নয়। পঞ্চাশের আগে কবির লেখার আলোচনা দুটি দলে হত অধিকাংশই। এক দল আদা-কাঁচকলা খেয়ে লেখাগুলিকে নস্যাৎ করতেন, অন্য দল কবিকে নিয়ে মহাবোধি সোসাইটি হলে অথবা অন্যত্র ও সর্বত্র মালা পরাবার জন্যে ছোটাছুটি করতেন। আগের দলের মধ্যে ডি. এল. রায় ও সজনীকান্ত দাস প্রমুখের আলোচনা চেষ্টা করলে আজও জানা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ অর্থেই শিল্পী ছিলেন এবং প্রতিভাবান, তাই এই উভয় প্রকার আলোচনাতেই নির্বিকার থাকতেন। অথবা থাকবার চেষ্টা করতেন। কেবল একবার সজনীকান্ত দাশের একটি আলোচনা পড়ে লিখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি—'সজনী, তোমার ছোট কলমে এত কালি ধরে!' (স্মৃতি থেকে দু-একটি শব্দ বাদ পড়লেও পড়তে পারে।) আশা করি এটা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না সজনীকান্ত যেটি লিখেছিলেন সেটি আর যাই হোক, সমালোচনা নয়। সেকালে লেখা নিয়ে আলোচনা তর্জার লড়াইয়ের পর্যায়ে ছিল। দু পক্ষই দুই মেরুতে।

আজও সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হয়নি। (এটা অবশ্য আপনারই কথা, আমি সমর্থন করছি মাত্র) তবে নতুন নতুন আবিষ্কারের মতই সমালোচনার ক্ষেত্রেও কিছু নতুন পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সমালোচনায় যথারীতি গোষ্ঠী ও দলাদলি আছে। গোষ্ঠীভুক্ত লেখকের যথানিয়মে পিঠ চাপড়ান হয় এবং সাহিত্যের 'নতুন

দিগন্ত' ইত্যাদি শোনা যায়। এবং দলের বাইরে হলে প্রাপ্তি স্বীকারের দুর্লভ সুযোগের মধ্যে লেখকের নাম ও বইয়ের নামের মুদ্রিত ঘোষণাটুকু থাকে। বেশির ভাগ লেখকই নিজের বইএর সমালোচনা নিজে লিখে পাঠান। অন্যথায় নিবিড় বন্ধুকে হাততালি-মার্কা একটা কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখতে নির্লজ্জ অনুরোধ করেন। উপেক্ষা অথবা অ্যাপ্রিসিয়েশন ছাড়া প্রকাশিত কোন পুস্তকের অন্য কিছু আলোচনা চোখে পড়ে না বললেই হয়। অন্ততঃ আমরা দেখিনি।'

আই বিলীভ নট

সংবাদপত্রে দেখলাম কলকাতার সাহিত্যিক, কলাকার ও চারুশিল্পীগণ নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের সম্মানার্থে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন মার্চ মাসে করেছিলেন। প্রেমেন মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ প্রখ্যাত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিগণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন; হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীগণ সুমধুর সঙ্গীতে তাঁদের আপ্যায়িত করেছেন। এ অনুষ্ঠানে বঙ্গসাহিত্যের কয়েকজন দিকপালের সক্রিয় অনুপস্থিতিও নজরে পড়ল। ঘটনাটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাজনিত উত্তাপ বহুদিন স্তিমিত হয়ে গেছে, নতুন ভাবে তার হঠাৎ-প্রকাশ সম্ভব বলে মনে করবার কারণ নেই। বিলেতে সদ্যপ্রকাশিত "দি লেফ্‌ট" নামক পুস্তকে ফ্রান্সিস হোপ নামে এক ভদ্রলোক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, এ শতাব্দীর পাঁচ দশকে ইংরেজ-সমাজের আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকরা একদিকে যেমন তাঁদের বক্তব্য ও বিষয় হারিয়েছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিত্তের সন্ধান পেয়েছেন। সিনেমা, কলার টি-ভি, জনতা-সংবাদপত্র এবং পাঠক-সমাজের বিরাট ব্যাপ্তির ফসল কুড়োতে গিয়ে সাহিত্যিকরা কেবল প্রত্যয়, বিশ্বাস, মতবাদই বিসর্জন দেন নি, ইনটেলেকচুয়াল হবার প্রয়োজনও তাঁদের শেষ হয়ে গেছে।

বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃত্ব করেন 'গ্রহণ' দিয়ে নয়, 'বর্জন' দিয়ে, 'প্রতিবাদ' দিয়ে। এ কথা অগ্রসর সমাজে যেমন সত্যি, অগ্রসরমান সমাজেও তেমনি। সৃজনশীল শিল্পীর প্রাণস্পন্দনে প্রতিক্ষণ প্রতিবাদ ধ্বনিত; নিজস্বতার সংকীর্ণ সামানা অতিক্রম করে বহুজনের

মূক অথবা অমুখর দাবীর দীপ্ত প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে এ প্রতিবাদ শিল্প-সার্থক। সাম্যবাদী সমাজে সাহিত্যকর্মীদের ব্যাপক গ্রহণমন্যতা তাঁদের শিল্পকে দুর্বল করে, এ কথা অনস্বীকার্য। চীনের নায়করাও এ-কথা জানেন, তাই সাহিত্য কর্মীদের তাঁরা বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন চীন-সমাজে সাম্যবাদ-পরিপন্থী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কলম ব্যবহারের। তৎসত্ত্বেও গত পনের বছরের চীন সাহিত্য এমন কিছু নতুন দৃঢ় পদসঞ্চারে সক্ষম হয়নি। তার অন্যতম প্রধান কারণ, শিল্পীগণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার হয় হারিয়েছেন, নয় বর্জন করেছেন। স্তালিন-যুগে রুশ উপন্যাস-সাহিত্যে শলোকভের তিন-খণ্ড উপন্যাস শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হবার প্রধান কারণ আমার মতে, তার মধ্যে সাম্যবাদী সমাজের নতুন বিন্যাস দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি মানুষের করুণ পরাজিত প্রতিবাদও সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট। স্তালিন-উত্তর সোভিয়েট য়ুনিয়নে সাহিত্যিককে কতখানি প্রতিবাদের অধিকার দেওয়া হবে তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে, হচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব-য়ুরোপের সাম্যবাদী দেশগুলিতে গত দশ-পনের বছরে সাহিত্য-শিল্পী-সমাজ শিল্পের স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, এ অধিকার তাঁরা হাত পেতে সরকারের দাক্ষিণ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি : দাবী করে, আন্দোলন করে, এমন কি লড়াই করে, আদায় করেছেন।

গণতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থা অন্যরূপ। শেলীর ভাষায় বলতে হয়, 'স্বাধীনতা' শব্দটির আজ পর্যন্ত বহু অপপ্রয়োগ হয়েছে, প্রতিদিন হচ্ছে। অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পী 'স্বাধীন'; প্রতিবাদের, সংগ্রামের অধিকার তাঁর স্বীকৃত। কিন্তু জীবনের বাস্তব নিয়ম প্রতিনিয়ত তাঁর 'স্বাধীনতা' পঙ্গু করছে। তাঁর হাতে পায়ে এবং মনে শৃঙ্খল পরাচ্ছে।

যে-সমাজে ব্যক্তিগত বিত্ত-ই প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ, যেখানে

দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা উপেক্ষা ও অস্বীকৃতি আনে, যেখানে বিত্তলাভের বহু-পথ প্রলোভন নীতি-লঘু সুন্দরী ললনার মত সর্বদা 'প্রস্তুত', সেখানে শিল্পীর 'স্বাধীনতা' বিকৃত পথে ধাবিত হতে বাধ্য। 'প্রতিবাদ' সেখানে বিকৃত রূপ নেয়, হয়ে ওঠে ব্যক্তির অসামাজিক প্রতিবাদ; যেমন সেক্স: 'লোলিতা'-ও প্রতিবাদ সাহিত্য, যেমন এককালে ছিল 'লেডী চ্যাটারলি' এবং 'ট্রপিক অব ক্যানসার'। কিন্তু 'লোলিতা'র প্রতিবাদ একটি একক ও একাকী মানুষের প্রতিবাদ, অনেকখানি তার নিজের বিরুদ্ধে, এক দুর্বল পরিণত-বয়স পুরুষের কিশোরী দেহের প্রতি দুর্দমনীয় প্রলোভনের বিরুদ্ধে। 'লোলিতা'র বঙ্গ-সংস্করণ সমরেশ বসুর 'বিবর', যার প্রধান আবেদন গলিতনীতি সমাজের বিরুদ্ধে একটি একক ও একাকী তরুণের ক্লীব, অসহায়, এবং অবশ্যম্ভাবী, সাময়িক প্রতিবাদ। এ ধরনের প্রতিবাদ আলবার্টো মোরাভিয়ার 'টাইম অব ইনডিফারেন্স' উপন্যাসেও দেখতে পাবেন। যেহেতু এ প্রতিবাদ একত্ব ছাড়িয়ে বহুত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে না, এবং যেহেতু লেখকদের প্রতিবাদ পাঠকের মনে প্রতিধ্বনিত না-ও হতে পারে, প্রধানত একারণে আমরা অনেকে এ ধরনের সাহিত্যে পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর বেশি কিছু দেখতে পাই নে।

যা বলছিলাম তা হল: গণতান্ত্রিক সমাজে এমন অনেক কিছু চরিত্র নামক ব্যবস্থা বলবান, যা সাহিত্যিকের দৃষ্টি, মনন ও লেখনীকে প্রতিনিয়ত বিত্তলাভের নানা পথে ধাবিত করে। তার সঙ্গে বর্তমান কালে রাষ্ট্রশক্তি গণতান্ত্রিক দেশেও এত ব্যাপক ও দাপট-দীপ্ত যে অধিকাংশ লেখকরা তাকে দক্ষিণ পাশে রেখে চলাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তা ছাড়া যে-সব দেশে মানুষের জৈবিক সমস্যাগুলি পরাজিত হয়ে গেছে—যেমন ক্ষুধা, বেকার, গৃহহীনতা, নগ্ন অত্যাচার ও শোষণ—সেখানে শিল্পীর প্রতিবাদ ব্যক্তিগত ও সূক্ষ্মতর হতে বাধ্য।

এ ছাড়াও আর একটা বড় কথা মনে রাখা দরকার। মানুষ আজকাল অনেক বেশি জানছে, তাতে তার জ্ঞানের সঙ্গে সিনি-সিজ্‌ম্‌ও বাড়ছে ; অন্যদিনের সবুজ আদর্শ আজ হলদে হয়ে গেছে। অর্থাৎ মানুষ তার 'ইনোসেন্স' রোজ হারিয়ে ফেলছে, রোজ আদম খাচ্ছে নিষিদ্ধ ফল। আমরা নিজেরাই রোজ দেখতে পাচ্ছি কথা ও কাজের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান, দেখতে পাচ্ছি আজকের আদর্শ কাল ভেঙে পড়ছে, কোনও 'সত্যই' কালের পরীক্ষা পাশ করতে পারছে না। তাই এ যুগে বিশ্বাস. প্রত্যয় ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে, চাই-চাই চাৎকারের কাছে কি চাই, কেন চাই, কোন পথে চাই এসব প্রশ্নে কান দেবার সময়, অথবা বাতা-বরণ, আর নেই।

সম্প্রতি দুটি প্রবন্ধ পড়লাম যাতে এ-যুগের মনন-সমস্যা কত জটিল তা আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়ল। লণ্ডনের টাইমস্‌ পত্রিকায় আসন্ন-প্রকাশ 'দি টেরিটোরিয়েল ইম্‌পারেটিভ' নামে একখানা পুস্তকের কিছু অংশ ছাপা হয়েছে যাতে লেখক দেখিয়েছেন, ভূমি নিয়ে মানুষের যে উত্তেজিত সংগ্রাম, বিনা যুদ্ধে সূচী পরিমাণ ভূমি ছাড়তে ইতিহাসের পাতায় পাতায় মানুষের প্রবল আপত্তি, যার জন্যে কত না অর্থহীন লড়াই এবং প্রাণক্ষয়, তার আসল কারণ হল, মানুষের অনেক আগে, জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে মাটি রক্ষার জন্যে আপ্রাণ আগ্রহ। অর্থাৎ লাদকের লোকবিরল খণ্ডে দু'মাইল ভারতীয় ভূমি চীনের কবলমুক্ত করার জন্যে আমাদের যে এই সংগ্রাম-ইচ্ছা, যাকে আমরা বলি দেশপ্রেম, আসলে তা হল লক্ষ-কোটি বছরের উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত অ্যানিমাল ইন্‌স্‌টিংক্ট (animal instinct)। এ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা স্বীকার ক'রে নিলে দেশে দেশে মানুষের দেশপ্রেমের অনেকটাই প্রশংসার চেয়ে করুণার ও সহানুভূতির উদ্রেক করবে বেশি, কেননা যে ইমোশনকে আমরা ভাবাবেগে রং লাগিয়ে মহান ক'রে তুলি, আসলে

ইভলিউশনের অসমাপ্ত পথে তা হল মানুষের মনে জান্তব অতীতের শৃঙ্খল।

অন্য প্রবন্ধটি পড়লাম কয়েক সপ্তাহ আগের 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায়। এখানেও লেখক দেশপ্রেমের শূন্যদিকগুলি দেখিয়েছেন। সাম্যবাদীরা একদিন সমস্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন: দুনিয়ার মজদুর এক হও। অথচ দেখা যাচ্ছে দেশপ্রেমের নামে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাজকে বহুখণ্ডিত, এবং পরস্পরবিদ্বেষী ক'রে তোলা অত্যন্ত সহজ। ভিয়েৎনামের উত্তরাংশ সাম্যবাদী, কিন্তু মার্কিন বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে যা-কিছু প্রতিবাদ আমেরিকায় ঘটছে তার সবটুকুই ছাত্র-শিক্ষক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের দ্বারা, একটুও শ্রমিকদের দ্বারা নয়। চীন ও রাশিয়া উভয়েই সাম্যবাদী দেশ, কিন্তু চীনে ও রুশে শ্রমিকরা কি ভয়ংকর ভাবে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিবাদে আত্মলুপ্ত!

এবার ভেবে দেখুন, আমাদের কালের কলাকারদের পক্ষে আদর্শ, বিশ্বাস, প্রত্যয় জীয়ন্ত রাখা কি ভীষণ কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের বলিষ্ঠ ভাবপ্রেরণা ছিল জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি। সংগ্রামের সম্মুখ পর্যায়ে ছিল কংগ্রেস, আর তার দেহে রক্তপ্রবাহ আসত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক কবি প্রবন্ধকারদের কাছ থেকে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় জাতীয় চেতনার যে স্রোতস্বিনী জন্ম নিয়েছিল, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে তা হ'য়ে দাঁড়াল মহাসমুদ্র। ভারতবর্ষের সর্বত্রই সাহিত্য জাতীয় সংগ্রামের প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল; বঙ্গদেশ বেশি ভাবপ্রবণ, তাই এখানে এ-মিশ্রণ হয়েছিল অধিকতর স্পষ্ট। আসলে আমাদের সাহিত্যের মেরুদণ্ড প্রতিবাদ। কখন কখনও প্রতিবাদ রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার ব্যাপক প্রকাশ সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে। শরৎ সাহিত্যের বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও তা অখণ্ড সামাজিক প্রতিবাদের সাহিত্য; অতএব, মর্মস্পর্শী এবং এখনও জীবিত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিবাদ বিশ্বমানবিক আবেদনে আশ্চর্য বলিষ্ঠ এবং কালাতীত। বর্তমান বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য যাঁদের রচনায় পরিপুষ্ট তাঁদের বেশির ভাগ একদিকে যেমন উপন্যাসে উপেক্ষিত, আহত, দলিত সমাজকে স্থান দিয়েছেন, অন্যদিকে সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদকে দিয়েছেন ভাষা ও ব্যঞ্জনা। তারাশংকর, প্রেমেন মিত্র, বিষ্ণু দে; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, অন্নদাশংকর রায়ঃ এঁরা সবাই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা ও ব্যঞ্জনা দিয়ে—সৃষ্টিশীলতার বসন্তঋতুতে এঁরা সাহিত্যের নামে মনোরঞ্জন করেন নি। ছোটগল্পে যেহেতু বাঙালী সাহিত্য মনীষার সুন্দরতম প্রকাশ, এই যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রতিবাদ তার বহুরূপ রূপায়ণও তাই ছোটগল্পেই অধিকতর পরিস্ফুট। 'গল্প-গুচ্ছ', বলতে গেলে, বঙ্গসমাজের উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক আলেখ্য, মানবিক আবেদনে অনবদ্য। অচিন্ত্য কুমার, শৈলজানন্দ ইত্যাদির ছোটগল্পে সামাজিক প্রতিবাদ কখনও রূপায়িত হয়েছে ব্যঙ্গে, কখনও অনুরণিত মানবিক আবেদনে, কখনও সাহসিক প্রত্যাঘাতে। অন্নদাশংকরের 'সত্যাসত্য'—বাংলায় একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস, এবং, আমার মতে, প্রত্যেক বঙ্গ-সাহিত্যে অনুরাগীর অবশ্যপাঠ্য—একই সঙ্গে আদর্শে উজ্জ্বল, প্রতিবাদে রূঢ়, ব্যঙ্গে কুটিল; তিন দশকের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালী মানস ও সমাজের অনেকখানি পরিপূর্ণ ইতিহাস।

আজ যদি আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের মেদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক দৌর্বল্য প্রকট হ'য়ে থাকে, তার প্রধান কারণ, বোধকরি, সাহিত্যিকের প্রতিবাদ পরিত্যাগ। বর্জনের পরিবর্তে গ্রহণে তাঁর অসাধারণ আগ্রহ। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়, বিশ্বাস ও আদর্শের ব্যাপক অবক্ষয়। এখানে অগ্রজদের ভ্রষ্টতা অনুজদের মধ্যে, তীব্রভাবে সংক্রামিত। তারাশঙ্করকেই ধরুন না কেন? 'ধাত্রীদেবতা',

'গণদেবতা' প্রমুখ উপন্যাসের রচয়িতার এখন কি কোনও প্রত্যয় অবশিষ্ট আছে? একখানা ছোট্ট গ্রন্থে তিনি তাঁর পরিণত এবং সাফল্যমণ্ডিত মনের যে-ছবি এঁকেছেন তাতে পুরাতন দিনের কোনও প্রত্যয়ের ছায়ামাত্র সন্ধান পাবার উপায় নেই। 'সম্রাটে'র প্রেমেন্দ্র মিত্র কি আজও সম্রাট? কংগ্রেসী রাজনীতি ও প্রসাশনের ব্যর্থতা কি আমাদের সাহিত্যিকদের এতই পঙ্গু করেছে যে প্রতিবাদ তাঁদের কণ্ঠে আর বাজছে না? বামপন্থীদের আত্মকলহ কি একই কারণে আমাদের সাহিত্যিক প্রত্যয়কে মরুপথে নিশ্চিহ্ন করেছে? আমি বর্তমান সাহিত্যিকদের উপন্যাস পড়ে বার বার প্রশ্ন করি: ইনি কোন পথের পথিক? এবং বার বার মনে হয়, ইনি কি পথ হারাইয়াছেন? কারুর মধ্যেই কোনও কনসিস্টেন্ট প্রত্যয়ের বিকাশ দেখতে পাইনে। সমরেশ বসুকে এর মধ্যে কিছুটা আলাদা মনে হচ্ছিল, কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় 'কালকূট' ছদ্মনামে বর্তমানে তিনি যে কথামৃত লিখছেন, পড়ে মনে হচ্ছে কালে দিনে তিনিও অচিন্ত্যকুমারের মত একনিশ্বাসে সবগুলি মহাপুরুষদের জীবনী রচনা করতে পারবেন। 'বিবর' লিখে 'পাপ' সঞ্চয়ের এই পাবলিক প্রায়শ্চিত্ত কি সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল?

নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান সাহিত্যিকদের পক্ষে উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্ন আমি তুলছি না। যাঁরা উচিত মনে করেন তাঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। যাঁরা ভাববেন অনুচিত তাঁদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করবো না। যদি মন্ত্রীত্বের পরিবর্তনকে যুগান্তর ব'লে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে বাংলার সৃজনশীল শিল্পীগণ আজ মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। একদল যাঁরা পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাতাবরণের সঙ্গে একাত্ম। অন্যদল, যাঁরা কংগ্রেসী মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত। তৃতীয় দল নিরপেক্ষ, যাঁরা বর্তমান মন্ত্রীদের চটাতে চান না, তাঁদের বিরোধীদেরও নয়, অথবা যাঁরা রাজনীতি থেকে সযত্ন দূরত্ব বেছে নেওয়া

কর্তব্য বলে মনে করেন। এ তিনদলের কারুর প্রতিই আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নে। তার কারণ, বাংলার সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে প্রত্যয়ের অবক্ষয় অনেকদিন চলে এসেছে, সহজে তার পুনরুদ্ধার হবে এমন ভরসা আমার নেই। চীন হামলার পরে শিল্পীদের মধ্যে স্বাদেশিকতার মহড়া দেবার জন্যে যে তীক্ষ্ণ প্রতি-যোগিতা দেখেছি, তাতে শ্রদ্ধায় যে আঘাত লেগেছিল এখনও তা সারে নি। ফ্রান্সিস হোপের সঙ্গে একস্বর হ'য়ে বলতে হয়, সার্থকতা ও বিত্ত সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ হরণ করেছে, বামপন্থী হবার প্রয়োজন আজ আর নেই, সবাই আমরা রাজশক্তি সমাজ-শক্তিকে দাক্ষিণে রেখে চলতে চাই, আমরা লিখি, কিন্তু ইনটেলেক-চুয়াল হবার দরকার আর আমাদের নেই। ডব্লু. এইচ. অডেনের ব্যালাড "ভিক্টর" আপনারা প'ড়ে থাকবেন। প্রত্যয় নামক ঈশ্বরকে সম্ভাষণ করে ভিক্টরের মত আমরাও প্রশ্ন করছি ও জবাব পাচ্ছি: Are you in Heaven, Father? But the sky said, "Address not known."

বিশ্বাস, প্রত্যয়, মূল্যবোধের ঠিকানা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই, সংবাদপত্রে যখন পড়লাম শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বঙ্গদেশ কেবল দেহে নয়, মনেও ক্ষুধার্ত, মনে হল তিনি জানেন না। সৃষ্টিশীল লেখক বলে আমরা যারা বর্তমান, আমাদের ক্ষুধা নেই, কেবল লোভ আছে।

ক্ষুধা আগুন জ্বালায়, লোভ বিবরে ঢুকে অন্ধকারে ছুরি শানায়।

এবার পত্রদাতাদের সঙ্গে কথা বলা যাক। কয়েকজন সংক্ষিপ্ত পত্রে 'একান্তে' পাঠ ক'রে আনন্দলাভের বার্তা জানিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ, কিন্তু তাঁরা আলোচনায় যোগদান করেন নি। কেউ কেউ আমার সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—তাঁদেরও ধন্যবাদ। কিন্তু 'একান্তে' চাণক্য সেনের প্রশস্তি হলে সুরুচিসম্মত হবে না।

প্রশংসার চেয়ে আলোচনা অধিকতর কাম্য। এবং এ কারণেই বোম্বাই শহরের Cadall Road, Dadar, থেকে শ্রীসুবল গাঙ্গুলীর পত্রখানা উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁর কাছে শারদীয় 'উল্টোরথে' প্রকাশিত এ্যান্টি-প্লে "তারারা শোনে না" "দুর্বোধ্য ও repugnant" লেগেছে, যদিও "তিন তরঙ্গ"কে তিনি "সুন্দর ও সার্থক" উপন্যাস মনে করেন। পত্রলেখকদের মধ্যে যাঁরা "তারারা শোনে না"-র প্রশংসা করেছেন তাঁরাও যেমন কারণ দেখান নি, সুবলবাবুও "repugnant" কেন লাগল বলেন নি। এ বিষয়ে যদি আপনারা বিস্তৃত আলোচনা করেন, নাট্য-সাহিত্য সমালোচনার সূচনা হ'তে পারে।

সুবল গাঙ্গুলী লিখেছেন, "আপনি কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যা লিখেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আপনার লেখা যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয়"। লক্ষ্ণৌ থেকে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ও চাইছেন, বাংলা উপন্যাসে সমগ্র ভারত-বর্ষের ছবি ফুটে উঠুক বঙ্গ সাহিত্য তার প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতা কাটিয়ে উঠুক। সুবলবাবু লিখেছেন, "আমার মনে হয় বাঙ্গলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীই একমাত্র প্রাদেশিকতার ও কলকাতা-কেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন।" সুবল গাঙ্গুলী সতীনাথের একটি স্মরণগ্রন্থ সম্পাদনা করছেন।

কলকাতার কাশীনাথ দত্ত রোড থেকে শ্রীকালিকা শেঠ যে-পত্র লিখেছেন তাঁর মধ্যে পাঠক হিসেবে তাঁর দাবী উচ্চারিত হয়েছে: "কোনও সাহিত্যিকের বছরে একটির বেশি বই লেখা চলবে না, চলবে না"। তিনি লিখেছেন, "আমার দাবী লেখকগণ আজেবাজে গল্প লেখা বাদ দিয়ে রসের মাধ্যমে প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করুন।" তাঁর পত্রের আর একটু অংশ উদ্ধৃত করছি: "আপনার 'একান্তে' শিরোনামায় সকল রচনাগুলিই পড়েছি। তার মাধ্যমে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধানের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। যে বিশেষ দিকটির দিকে

আমার চোখ খুলেছে ‘। হল নিরপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচনা, যা আমাদের সাহিত্যে উ…ক্ষিত।…আপনার রচনা পড়েই আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ চেতনা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সত্যিকারের নির্ভীক সাহিত্য-সমালোচনার ব্যবস্থা হলে…আমাকে আর চকচকে মলাট দেখে, লেখকের বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হয়ে [বই কিনে বা এনে] ছু-পাতা পড়ার পর [এখানে পত্রলেখক কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম করেছেন] ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে না।”

হুগলী জেলার মগরা গ্রাম থেকে শ্রীহেমেন চৌধুরী সুলিখিত পত্র দিয়েছেন। তিনিও বাংলা সাহিত্যের “সত্যিকার সমালোচনা” দাবী করেছেন, যার জন্যে চাই “নির্ভীক আপসহীন সমালোচক, যা আজকের বাংলায় পাচ্ছি না।” ‘একান্তে’ তাই তাঁর কাছে উল্টোরথে’র “এক বড় আকর্ষণ”। সমরেশ বসুর ‘বিবর’ পড়ে তাঁর ভাল এবং খারাপ দুই-ই লেগেছিল, মনের অনেক কিছু প্রশ্ন ও খটকার জবাব তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সমালোচনা’য় পান নি।” কিন্তু কোথায় যেন, কেন যেন ‘বিবর’কে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না; তাঁর প্রশ্নের জবাব “সত্যিকার ভাবে ‘একান্তে’তেই পেলাম।” হেমেনবাবু এবং আপনাদের সবাইকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। ‘উল্টোরথে’র সম্পাদকগণ ‘একান্তে’ রচনায় আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন: যা আমি লিখেছি তার একটি লাইনও তাঁরা বাদ দেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের সম্পাদকীয় নীতি উদার ও প্রশংসনীয়। ‘একান্তে’র মতামত, ভুল-বিচ্যুতির পূর্ণ দায়িত্ব আমার, তাঁদের একটুকুও নয়। যে-সকল সাহিত্যিক সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি ‘কঠিন’ মতামত প্রকাশ করেছি তাঁরা সবাই ‘উল্টোরথে’র আদরণীয় লেখক, কিন্তু সম্পাদক সমালোচনার অধিকার আমাকে পুরোপুরি দিয়েছেন। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধদেব বসুর শারদীয় সাহিত্যকৃতির সমালোচনা অনুপস্থিত দেখে ভেবে বসেছেন, এর জন্যে দায়ী ‘উল্টোরথে’র সম্পাদকগণ,

তাঁরা ভুল করেছেন। যদি এ আলোচনা কখনও 'একান্তে' সম্ভব হয়, সম্পাদকের কলম তার বুকে ছুরি বসাবে না। আপনারা যাঁরা বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের উপন্যাস অপছন্দ করে আমাকে লিখেছেন, তাঁদের উচিত সুস্পষ্ট ভাষায় নিজস্ব মতামত সে-সব সাহিত্যিকদের সরাসরি জানান। 'একান্তে'র উদ্দেশ্য নয় কাউকে আক্রমণ বা আঘাত করা।

কালিম্পং থেকে শ্রীদীপংকর দাশগুপ্তের পত্রের কিছুটা উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধের শেষ টানছি ঃ

"কিছুদিন আগে আমি কলকাতার 'স্বরান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅমল রায়চৌধুরীর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। তার কিছুটা অংশ তুলে ধরছি ঃ 'স্বরান্তর' যদিও বাংলা ছোটগল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা, এবং প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী তরুণ লেখকবৃন্দ এর নিয়মিত লেখক, কিন্তু তবুও প্রতি মুহূর্তের প্রতিকূলতার দরুন 'স্বরান্তর' নিয়মিত প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। শারদীয়া সংখ্যার পর এখনও পর্যন্ত আর কোন সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।' শ্রীরায়চৌধুরীর এই ক্ষোভ একটি সত্যকেই প্রকাশ করে ঃ বাঙালী পাঠক-পাঠিকা গোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ ছোটগল্প পড়েন না, কিংবা পড়তে চান না। সম্পূর্ণ উপন্যাস, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, সুবৃহৎ বড় গল্প তাঁদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। সেই প্রচণ্ড আবর্তনের মধ্যে ছোট-খাট বস্তু নজরে পড়বে কেন? এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলিও অবশ্য কিছুটা দায়ী। গত শারদীয়-সাহিত্য মন্থন করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ বাণিজ্য-পত্রিকার পূজা সংখ্যাতে ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাসের সংখ্যা বেশি ছিল। সাত-আটটি সম্পূর্ণ উপন্যাস যেখানে মহানন্দে রাজত্ব করছে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ছোট-গল্পের ভূমিকা 'মৃত সৈনিকের' চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না। আর সে কী উপন্যাস! মুড নেই, বিন্যাসের সৌকর্য নেই, নেই স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা কিংবা সংলাপের

পরিমিত দীপ্তি। যে সব ছোটগল্পকে 'মেরে' ওই অখাদ্যগুলোকে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেই গল্পগুলিও কী শিল্পশূন্য ছিল? সন্দেহ হয়।

"বিমল মিত্তির, হরিনারায়ণ, নীহার গুপ্তদের লেখা বাতিল করা হোক এমন দাবী নিশ্চয় কেউ করবেন না। কিন্তু ওঁদের 'ঘুমপাড়ানী' লেখাগুলি একটু কণ্ট্রোলড্ হলে ভাল হয় না কী?

'সেনমশায়, আপনার বিরুদ্ধেও একটা অভিযোগ আছে। উল্টোরথের 'একান্তে' বিভাগে প্রসঙ্গক্রমে আপনি প্রায় সব নামী সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের সৎ-সাহিত্যিক বিমল কর সম্বন্ধে আপনি নীরব। কিন্তু কেন? শ্রীযুক্ত করের লেখায় রাষ্ট্রীয় চেতনা নেই বলে?"

যতদূর স্মরণ আছে, একবার আমি লিখেছিলাম 'দেওয়াল' অতি সুন্দর উপন্যাস, অথচ পাঠক-মহলে তার উপযুক্ত আদর হয় নি। বিমল করের সাহিত্যকৃতি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, এবং এখনও প্রতিশ্রুতিময়।

তর্কে বহুদূর

আমার কোনও উপন্যাস বা গল্প এ পর্যন্ত ছায়াছবিতে রূপবাণীত্ব লাভ করে নি। বছর পাঁচেক আগে শ্রীতপন সিংহ 'রাজপথ জনপথে'র সিনেমাসত্ত্ব অর্জন করেছিলেন; যে-কোনও কারণে হোক, এর বেশি তিনি এগোন নি, বা এগোতে পারেন নি। গতবছর দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হয়েছিল। বলেছিলেন, সিনেমার জন্যে অন্য একটি কাহিনী লিখে দিন। উত্তরে বলেছিলাম, 'সিনেমার জন্যে সাহিত্য করবার সর্বনাশা উচ্চাশা আমার নেই। দীর্ঘকাল রোমন্থনের পরে এক-একখানা উপন্যাস লিখে থাকি, যদি তাদের কোনও একটি, বা সব-কটি, সিনেমায়িত হবার যোগ্য হয়, এগিয়ে আসবেন আপনারাই। না এলে আমার একটুও ক্ষেদ নেই।' পরে মাথায় অনেক দুষ্টু বুদ্ধির মধ্যে একটি, দেখতে পেতাম, সময় সময় উচিয়ে উঠত: 'উল্টোরথে'র উদার অতিথি-বাৎসল্যের সুযোগ নিয়ে কখনও একদিন একটি কাহিনী লিখব, যার নাম হবে 'তর্পন সিংহের জন্যে'। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারতাম, ও-কর্ম আমার দ্বারা হবে না।

কেন হবে না তার পরিষ্কার প্রমাণ পেলাম নববর্ষ সংখ্যা 'উল্টোরথে' শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস' পাঠ করে। সবাই জীবনে সব কিছু পারে না। আমি যেমন জীবনে তেনজিং নরকওয়ের মত হিমালয়ের শীর্ষে উঠতে পারব না, তেমনি কোনওদিন পারব না বাংলা সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকের জন্যে 'ক্যাপসিউলড্' কাহিনী লিখতে।

হরিনারায়ণবাবুকে দোষ দিই না, বাহবাও নয়। কোন্ বৈশাখী

তাড়নায় তাঁকে 'টলিউড'কে লক্ষ্য ক'রে 'সুরের পরশ' লিখতে হল, তা জানি না। তবে জানি, যে দুরারোগ্য ব্যাধি বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার সততপ্রসারমান দাবী থেকে আত্মরক্ষা সহজ নয়। ক্ষণে ক্ষণে নিবিছে দেউটি।

গতমাসে সিনেমা-পরিচালক শ্রীঅরূপ. গুহঠাকুরতার সঙ্গে দিল্লীতে আলাপ হল। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সিনেমার গল্প নিয়ে উঠল কথাবার্তা। তিনি বললেন, গল্প নির্বাচন অতি কঠিন কাজ। কারণ যা দিলেন, তাতে মনে হল, কঠিনের বাবা। সিনেমা আসলে ব্যবসায়। যে-ছবি 'হিট' হবে না, তার পরিচালকের মৃত্যু অনিবার্য। আর 'হিট হতে হলে গল্পে এমন-সব উপাদান চাই যা সরলতরল বাঙালী মনে দু'ঘণ্টা অনবরত সুড়সুড়ি দেবে। এ প্রয়োজনের দাবী মিটিয়ে গল্প-নির্বাচন নিশ্চয় গল্প-লেখার চেয়ে অনেক কঠিন।

অধিকাংশ বাংলা ছবি দেখতে গেলে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে সঙ্গে করে একটি পরিধান নিয়ে যেতে হয়, যার নাম, কবি কোলরিজের ভাষায়, willing suspension of disbelief, অর্থাৎ বিশ্বাসে মিলায় সত্য, তর্কে বহুদূর। জীবনে যা হয় না, হ'তে পারে না, সিনেমায় তা হতেই হবে, কেন না তা না হ'লে বাঙালীমনের মুমূর্ষু স্বপ্ন মুহূর্তের জন্যেও প্রাণলাভ করবে না। এমন কি ডায়ালগ যাঁরা লেখেন তাঁরাও চরিত্রগুলির মুখে এমন ভাষা দেন যা বাস্তবে আমরা বিশেষ বলি নে। ফলে, অধিকাংশ বাংলা সিনেমা আধঘণ্টা দেখলেই বোঝা যায় কাহিনী কোন্ আঁকাবাঁকা পথে বেকিয়ে বেকিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, যেমন অধিকাংশ উপন্যাস অর্ধেক পড়লেই বোঝা যায় কাহিনীর পরিণতি কোথায়, কেমন, কি-ভাবে অপরিণত থেকে যাবে। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে যেমন বহুলাংশে একই কাহিনীর অক্লান্ত পুনঃবিন্যাস, বাংলা সিনেমাও তাই, তার চেয়ে অনেক বেশি। পয়সা খরচ করে প্রতিদিন আমরা এই একই

তরল 'আনন্দ' উপভোগ করছি। সমকালীন বাংলা নাটকে জীবনের বাস্তব পরিচয় যদি-বা কখন-সখন মেলে, যদি-ও প্রায় সর্বদা তা রোমান্টিকতায় তরলিত, সিনেমা এখনও কি সুন্দর 'ইনোসেন্ট'।

আসলে, বাঙালী—তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ এখনও নাবালক; তার ইনোসেন্সের সীমা নেই। অথচ এক্ষেত্রে ইনো-সেন্টই হল সবচেয়ে বেশি অপরাধী। আমরা যেমন প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস লিখতে পারি নে—ছোট গল্পে প্রাপ্তবয়স্কতার স্বাক্ষর অনেক বেশি—তেমনি আমরা প্রাপ্তবয়স্ক ছায়াছবিও তৈরি করতে পারি নে। যে-সব ছবি ভারতবর্ষে 'কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে' প্রদর্শিত হয়, তা বুড়োবুড়ীদের মনেও তারুণ্যের তরল তাপ আমদানী করে। যখনই আমাদের মধ্যে কোনও একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছায়াচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন, অথবা প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস রচনায়, তখনই আমরা দর্শক ও পাঠকরা তাঁকে নিন্দা ও উপেক্ষার চাবুকে পঙ্গু ও আহত করেছি। বাংলা সাহিত্যে, শিল্পে, তাই প্রাপ্তবয়স্ক ট্রাডিশন আজ পর্যন্ত বিশেষ প্রশ্রয় পায় নি। প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এখন বিস্ময়কর স্মৃতিমাত্র; এ-কালের ক্ষুধা মেটে 'রম্য-রচনায়'। রাজশেখর বসুর বলিষ্ঠ নির্ভেজাল র‍্যাশনাল দৃষ্টিকোণ বর্তমানকালের একজন সাহিত্যিকের মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে নি। বাংলা ভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস লিখেছেন একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর শঙ্খ ধুলায় অবলুণ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে দিল্লীর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীমনোজ বসুর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। মনোজবাবু বলেছিলেন, 'চোরকে সাধু দেখান সহজ, সাধুকে চোর দেখান সহজ নয়।' শুনতে শুনতে আমার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' মনে পড়ছিল। অত বছর আগে অমন বলিষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস রচনা তাঁর শিল্পমনের প্রত্যয় ও সাহসের জ্বলন্ত প্রমাণ।

অথচ বাঙালী পাঠক 'অহিংসা'কে উপযুক্ত সমাদর দেয় নি, যেমন দেয় নি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকৃতিকে। সিনেমাক্ষেত্রে একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া অ্যাডল্ট থীম নিয়ে ছবি তোলার দুঃসাহস আর কেউ দেখিয়েছেন কিনা সন্দেহ: অনেক চেষ্টায় দু-একটি আংশিক প্রচেষ্টা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের প্রাপ্তবয়স্ক ছবিগুলি—'পরশ পাথর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' —দর্শক-সমাজ গ্রহণ করেন নি। ফলে, অর্থক্ষতির আত্মঘাত হতে বাঁচবার জন্যে তাঁকেও এমন সব ছবি তুলতে হয়েছে যার কাহিনীতে প্রাপ্তবয়স্কতা ও অ্যাডোলেসেন্স সংমিশ্রিত। 'অভিযান' থেকে ('চারুলতা' বাদ দিয়ে) 'নায়ক'পর্যন্ত। 'নায়ক'-এর কথাই ধরুন না কেন। পার্শ্ব-চরিত্র-বিন্যাসে মাঝে মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বাস্তব অবস্থার ওপর আশ্চর্যসংক্ষিপ্ত আলোকপাত: যেমন স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের মধ্যে মানসিক যোগাযোগের অবক্ষয়, যেমন স্ত্রীকে ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্যে চতুর বিনিয়োগে স্বামীর অস্ফুট অগোপন প্রয়াস। অথচ 'নায়কে'র জীবনে যে-তিনটি 'সমস্যা' বা 'বিবেক-সংকট' সত্যজিৎ রূপায়িত করেছেন, তার একটিও adult নয়, প্রত্যেকটি মধ্যবিত্ত-মানসের 'ইনোসেন্সে' মোলায়েম। যে দার্শনিক কারণে বাংলা ছায়াচিত্রে ধনী ব্যবসায়ীর সুপুত্র অনবরত আদর্শবাদের জ্বালায় দরিদ্রকন্যার প্রেমে পড়েন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সে কারণেই 'নায়ক' আর্থিক সার্থকতার মধ্যে শিল্প-আদর্শের শত্রু একমাত্র স্বপ্নের মধ্যেই আবিষ্কার করে, এবং নারী-সঙ্গম ও মদ্যপানকে পাপাচার প্রমাণিত করে।

না সাহিত্যে, না ছায়াচিত্রে এখনও আমরা জীবনের নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলার জন্যে তৈরি। ছায়াচিত্রে যেহেতু চুম্বন নিষিদ্ধ, তাই অনেক গান, অনেক বকবকানি, দুষ্প্রাপ্য ফিল্মের সাংঘাতিক অপচয়। সাহিত্যেও যেহেতু আসল কথাটা

সহজভাবে বুঝবার ও বলবার ক্ষমতা ও সাহস আমাদের এখনও অনায়ত্ব, তাই আমরা অনেক বাজে কথা লিখি ও বলি। 'ইনোসেন্স' আমাদের রোমান্টিকতাকে সযত্নে পুষে রাখে। এর প্রকাশ-বিন্যাস চোখ মেললেই ধরা পড়ে। শংকরের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'রূপতাপস'। আগাগোড়া এমন আশ্চর্য 'রোমান্টিক' যে পড়লে অবাক হ'তে হয়। 'শংকর' একালের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় লেখক; তাঁর শিল্প-নিষ্ঠা সন্দেহাতীত। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকৃতিতে এখনও রোমান্টিক ট্রাডিশন জড়িয়ে আছে। ১৯৬৭ সালে একজন Sculptor-এর সাহিত্য-রূপায়ণে তিনি যে উচ্ছ্বাস-প্রবণতা দেখিয়েছেন, একমাত্র বাংলা সাহিত্যেই তা মার্জনীয়। 'রূপতাপস' নাম নিয়েই আমার প্রথম আপত্তি। আমরা যদি এখনও শিল্পীকে তাপস বা সাধক মনে করি, আমাদের ইনোসেন্স কাটবে কবে? তাহলে চোরকে সাধু করবার জন্যে মনোজ বসুকে সাহিত্যিক সাধুবাদ দেব না কেন? 'রূপতাপস' নামের দ্বিতীয় অপরাধ হল লেখক প্রথম থেকেই পাঠকের মনে তার প্রধান চরিত্রের একটি রূপ অঙ্কিত ক'রে দিচ্ছেন, কাহিনীর বিন্যাসে যার কোনও অবক্ষয় নেই। উপন্যাসের ক্রাইসিস হল শিল্পীর মৃত পুত্রের একটি মূর্তির পুনরুদ্ধার। আবেগময়, সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যে এ হল বড়জোর ছোটগল্পের ক্রাইসিস, উপন্যাসে বিন্যাসিত হলে অধিকাংশ বাংলা ছায়াচিত্রের মত বলাৎকারে দীর্ঘায়িত মনে হ'তে বাধ্য। এ কোন্ বাংলা দেশ 'শঙ্কর' আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে একজন Sculptor-কে নিয়ে জনসমাজ উদ্বেলিত? শঙ্করের একটি গল্প পড়ে প্রশ্ন জেগেছে, এ কি ১৯৬৬-৬৭ সালের ভারতবর্ষ, যেখানে একটি আমেরিকান কন্যা ভারত গুণগানে মুখরিত? শংকর কি জানেন না, ইংরেজ-আমেরিকানরা আমাদের চেয়ে কথাবার্তায় ভদ্র হলেও, কম উচ্ছ্বাসময়, তাঁদের স্বভাব under-statement, over-statement নয়? তা ছাড়া, 'রূপতাপসে'র ধনী নারীর মধ্যে

'চৌরঙ্গী'র প্রভাব; এ-ও ট্রাডিশনাল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মানসে ধনী-সমাজের বিকৃত ছবি। 'রূপতাপস' পড়তেও সেই অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বসতে হয় : willing suspension of disbelief.

১৯৬৬ সনের শারদীয় 'উল্টোরথে' শঙ্করের একটি গল্প পড়েছিলাম, তাতেও সুন্দর সম্ভাবনার দুর্বল বিন্যাস চোখে পড়েছিল। ছোট্ট একটি ডাকঘরের একক পোস্ট-মাস্টার একমাস ধরে পায়তাড়া কষে শেষপর্যন্ত এক গণিকার ঘরে এক সন্ধ্যেবেলা হাজির হল। গণিকার হাত থেকে মদের গ্লাস গ্রহণ করে পান করল। কিন্তু যে-মুহূর্তে জানতে পারল গণিকার কোনও নিকটাত্মীয় একই পাড়ার বাসিন্দা, সেই মুহূর্তে সে দৌড়ে পালাল। 'শঙ্কর' দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত চেতনায় গণিকার এক অতি-romantic image, যা শরৎসাহিত্য থেকে ধারাবাহিক প্রবাহিত। অথচ সামান্য তির্যক ব্যঙ্গের দ্বারা এ বিন্যাসকে অনেক ধারাল করা যেত, যা তিনি করেন নি। ফলে সুলিখিত, নিপুণ পারিবেশিত গল্পটিও শেষ পর্যন্ত তরল ভাবে শেষ হল। 'শঙ্কর'কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করি, লেখক হিসেবে তাঁকে সম্ভাবনামণ্ডিত মনে করি। তাঁর আশ্চর্য জনপ্রিয়তা যে-কোন লেখকের গর্বের বিষয়—বাংলার বাইরেও তিনি বহু-পঠিত। তাই তাঁর কাছে সবিনয় নিবেদন, সাহিত্যকৃতিকে তিনি কঠিন আত্ম-বিচারে, বিশ্লেষণে, সমীক্ষায় অনুশীলন করুন। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, 'বাংলা দেশের পাঠক কিছুদিন বোকা বনতে রাজী, চিরদিনের জন্যে নয়।' কথাটা তাঁকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া থেকে কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন :

'আমার মনে হয়, জনপ্রিয়তার বা বাস্তবতার একটা দিকে

গজেন্দ্র মিত্রের জুড়ি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নেই। সেটা হচ্ছে মফস্বল অঞ্চলের বাংলাদেশ ও বাঙালী মধ্যবিত্তদের কাহিনী বর্ণনায়। তাদের আচার আচরণ, তাদের চরিত্র-বিশ্লেষণ এসব ব্যাপারে আমি তো বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিফলন দেখি শ্রীমিত্রের রচনায়। এইসব অঞ্চলের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলো ঘটতে দেখি আমরা এখানেও। মানে—'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে' ও 'পৌষ-ফাগুনের পালা'তে। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, যেমন ধরুন, এখানকার লোকের কথায় কথায় আদ্যিকালের ছড়া বলা। এই উপন্যাসটি পড়া আর মফস্বল-জীবন দেখে উপলব্ধি করা আমার কাছে একই। উপন্যাসটি এতই জমাটি ও ঘরোয়া! মনে হয় যেন এসব ঘটনা আমাদের জীবনেরই। মহাশ্বেতা বা শ্যামাঠাকুরাণীর মধ্যে তো আমরা আমাদের মা-ঠাকুমাকেই খুঁজে পাই। আপনি নিশ্চয় জানেন, গ্রাম-ঘেঁষা মফস্বলের মেয়েলোকেরা কেমন মুখরা হয়, কথায় কথায় ছড়ার ফুলঝুরি ছড়ায়। গালি-গালাজ বা ঝগড়া করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। অবশ্য গজেন্দ্র লিখিত ওই তিনখণ্ডের মধ্যে 'কলকাতার কাছেই' আকাদমী পুরস্কার পেলেও, 'পৌষ-ফাগুনের পালা'ই আমার ভাল লেগেছে বেশি। মহাশ্বেতা ও শ্যামার ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণ, বাক-বিন্যাস টাইপ মনে হয়েছে আমার কাছে এই উপন্যাসে।

'হয়তো আপনার একথা সত্যি যে বাংলা সাহিত্যে গজেন্দ্র মিত্রর অবদান নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মত মফস্বলবাসীরা গজেন্দ্রবাবুর লেখায় আমাদের জীবনেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখে, যুগপৎ মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন এবং আমার মতে, আমাদের এই আনন্দ লক্ষ্য করে ও তাকে স্বীকৃতি দিয়ে [আকাদমি পুরস্কার মারফৎ] বিচক্ষণতার পরিচয়ই রেখেছেন আকাদমী কর্তৃপক্ষ।'

হাওড়া থেকে শেলী পাল : 'আপনি চৈত্র সংখ্যা উল্টোরথের

'একান্তে' সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার দান প্রসঙ্গে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। পুরস্কার কাকে দেওয়া উচিত বা অনুচিত সে প্রসঙ্গে আপনার মতামত যতদূর ব্যক্ত হয়েছে তা থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে, আপনি বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগতদের সমাদর করার ঘোর পক্ষপাতী এবং এটা সকলের কাছেই যথেষ্ট বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার একটা নেতি-মূলক বক্তব্য আছে। তার আগে একটা সাফাই গেয়ে রাখি, আমি কিন্তু এ বাবদে মোটেই কনজারভেটিভ নই। প্রথম কথা, এখনই বাংলার সাহিত্য-জগতে নবাগতদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, যথেষ্ট। এটা অবশ্য আমার ধারণা। আপনি নিজেও যে কোন সপ্তাহের 'দেশ' অথবা 'অমৃত' পত্রিকায় যে পাতাগুলোতে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে লক্ষ্য করলে অনেকগুলো অপরিচিত নাম দেখতে পাবেন, যাদের অধিকাংশ উপন্যাসই আবর্জনা বিশেষ। উপন্যাসগুলোর ধারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন লেখক চেয়েছেন সেন্টিমেন্টের কাঠিতে সেক্সের তুলো লাগিয়ে পাঠকের কানে সুড়সুড়ি দিতে। কোন কোন উপন্যাসের শেষে যদি বা সুন্দর জীবনের জয়গান করা হয়ে থাকে, সত্যিকারের মানসিক আবেদন কোনটারই নেই। তবে একটা কথা, সুড়সুড়ি কিন্তু যথেষ্ট সুখদায়ক হয়ে থাকে যতক্ষণ সেটা চলতে থাকে, তারপরই সেই অপরিসীম বিরক্তি। তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, শুধু খবর কাগজের রিপোর্টে যেমন উপন্যাস সৃষ্টি সম্ভব নয় তেমনি অসম্ভব গোটাকতক আজগুবী কল্পনাকে কিছু অলীক এবং কিছু বাস্তব ঘটনা দিয়ে জুড়ে গেঁথে।

'এই প্রসঙ্গে মোপাসাঁর একটি কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা আপনারও জানা থাকতে পারে। প্যারিসের সমালোচকরা মোপাসাঁর কোন নূতন উপন্যাস বেরোলেই নানাভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় দোষ হ'ল সেটি একটি

উপন্যাসই নয়। মোপাসাঁ তার উত্তরে বলেছিলেন 'যে লেখকগণ আমাকে এই সমালোচনায় সম্মানিত করেছেন তাঁদেরও সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে তাঁরা আদৌ সমালোচকই নন।' নাতিতীক্ষ্ণ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি করলাম, ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক। এই ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আমার একটিই। সেটি হ'ল এই যে বাংলাদেশের সমালোচকদেরও ঐ সব অর্বাচীন অথচ যশ অথবা অন্য কিছু লোভী লেখকদিকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাঁরা যা লিখেছেন তা আদৌ ছাপানোর যোগ্যই নয়।

'তবে আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই নয় যে বাংলাদেশ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বন্ধ্যা হয়ে থাক। নূতন সৃজনশীল প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে আমরা উন্মুখ। আজ আমরা সেই লেখককে নিশ্চয়ই সাদরে বরণ করে নেব যিনি আমাদের উপহার দেবেন কিছু আঙ্গিকের মৌলিকত্ব, কিছু চরিত্র-চিত্রনের মুন্সীয়ানা, কিছু ঘটনা সংস্থাপনের, আর যদি সম্ভব হয় কিছুটা মিষ্টি-মধুর স্টাইল এবং টেকনিক। তাই বলে আমি বলছি না যে নবাগত সাহিত্যিককে প্রথমেই আমাদের কিছু ধ্রুপদী সৃষ্টির ডালি ধরে দিতে। কিন্তু সাহিত্য যেন ওষুধের নামে রঙিন জল না হয়। আমাদের নবাগতদের মধ্যে এই অ্যাডালটারেশানের পার্সেন্টেজটা এত বেশি হয়ে গেছে যে যদি বা কারও ভাণ্ডারে দু-চার চামচ ট্যালেণ্ট থেকে থাকে, তাও আবর্জনার স্তূপে চাপা পড়ে নাদার দাখিল হয়েছে। ঠিক যেমন বানের সময় পুকুর-গুলোর স্বচ্ছ জলও ঘোলা হয়ে যায়।'

খড়গপুর থেকে সুধীর ব্যানার্জী সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের ওপর মন্তব্য করেছেন যা স্থানাভাবে আমি উদ্ধৃত করতে পারছি না। তাঁর নালিশ হল যে আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিনি। সংক্ষেপে একবার উল্লেখ করেছিলাম, মনে পড়ছে, যে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত

সুখপাঠ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস নবীন সাহিত্যিকদের হাতে বৃদ্ধি ও পুষ্টি পেল না। জব্বলপুর থেকে এম. এল. চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে সারা ভারতবর্ষেই সাহিত্যিকের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, এটা বাংলার নিজস্ব সমস্যা নয়। 'আজ পর্যন্ত যত লেখকের বই পড়েছি ...স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় একবার সিঁড়ির শেষধাপে উঠে গিয়ে আবার এক-পা দু-পা করে আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন, এবং এখন এক ব্যবসায়িক পর্যায়ে এসে নেমেছেন। বঙ্গদেশ থেকে শুরু করে সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত যত সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা দিকপাল, সকলেই এক ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ছেন, বর্তমানে সকলেরই লক্ষ্য কোন চলচ্চিত্র-প্রযোজক বা পরিচালকের লক্ষ্য-ভেদ করা।'

এ-ধরনের মন্তব্যে একদিকে অজ্ঞানতা, অন্যদিকে দায়িত্বহীনতা, প্রকাশ পায়। হিন্দী সিনেমার গল্প এখনও পর্যন্ত খুব কমই নেওয়া হয় হিন্দী সাহিত্য থেকে—ও-ধরনের গল্পের জন্যে এক-রকম মেধার প্রয়োজন যা শুধু বোম্বাই-এর স্টুডিওতেই পয়দা হয়, লালিত হয়। চক্রবর্তী মশায় মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, হিন্দী, মালয়ালম সাহিত্যের বিশেষ খবর রাখেন না, তাই এ-ধরনের মন্তব্য করে বসেছেন।

মুর্শিদাবাদ থেকে তাপস ঘোষ নতুন সাহিত্যিকদের স্বীকৃতি কেন এত বিলম্বিত, এ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। কয়েকটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন, যেমন 'সাহিত্যের বাজারে পুরাতন সম্রাটদের জৌলুস'; এক বিরাট পাঠক-গোষ্ঠী 'যারা স্বভাবতই ভেঙে-পড়া, ধ্বসে-যাওয়া সাহিত্যের আকাশ দেখতে ভালবাসে'; যারা 'নতুন প্রভাতের স্বাদগ্রহণে অনিচ্ছুক'; তৃতীয়ত, পত্রিকাগুলির বিখ্যাত লেখকদের প্রতি বাধ্যতামূলক দুর্বলতা, এবং নতুন সংস্কৃতি-সাহিত্য পত্রিকার স্বল্পায়ু। তাপসবাবুর কারণগুলি ঠিক; তবে বলব, নতুন সাহিত্যিকদের অত সহজে ধৈর্য হারালে চলবে না।

দীর্ঘকাল পরিশ্রমের আগে স্বীকৃতি খুব বেশি সাহিত্যিক কোনও দেশেই পান না।

পরিশেষে একটি সত্য কথা বলা দরকার। পত্রলেখকগণ 'একান্তে'র উৎসাহী পাঠক জেনে আমার ভাল লাগছে, উৎসাহ বাড়ছে। কিন্তু যাঁরা আমার 'সৎসাহসে'র প্রশংসা করছেন, তাঁদের কথার অর্থ দুর্বোধ্য। সাহিত্য চিরদিন আঘাত করে আসছে, প্রতিবাদ তার পাথেয়। কাউকে আঘাত করব না, অপ্রিয় বলব না, শুনব না, লিখব না এমন মন্ত্র নিয়ে সাহিত্য করা অসম্ভব। তাঁবেদারী করে চাকরী বহাল রাখা যায়, উন্নতিও অসম্ভব নয়, কিন্তু সাহিত্যকৃতি একেবারে অসম্ভব।

বুদ্ধিজীবীদের ওপরে বিদেশী প্রভাব নিয়ে ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছি যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কম দামী মাল, তাকে কিনতে না লাগে অনেক অর্থ, না অনেক প্রচেষ্টা, তার স্বকীয় স্বত্বা এত দুর্বল যে অনায়াসে তার মধ্যে পরদেশী মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব, এবং স্বাদেশিকতা তাব এত কমজোর যে তার মাধ্যমে বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। কথাটা আরও প্রাঞ্জল ও কঠিন ভাবে বলা দরকার। গত তিন চার বছর ভারতবর্ষে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যাতে কারুর মধ্যে যে সততা, চরিত্রবল, স্বকীয়তা থাকতে পারে এ বিশ্বাস আমরা হারাতে বসেছি। পার্লামেণ্ট ও বিধান সভায় প্রতি সপ্তাহে সমবেত বা একক ধ্বনি উঠছে যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সৎজন-পত্নী বুঝি একজনও নেই, প্রত্যেক মন্ত্রী-উপমন্ত্রীই অসৎ, প্রত্যেক রাজকর্মচারী ঘুষখোর কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ ঘেরাও। সংবাদপত্রে যাঁরা কাজ করেন সেই সাংবাদিকদের সম্বন্ধে প্রতিদিন যে মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায় তা হল: 'অমুক অমুকের দালাল,' অথবা 'দু বোতল হুইস্কি দিলেই অমুককে দিয়ে যা চাও তা লিখিয়ে নিতে পারবে।' যে-কোনও প্রেস ক্লাবে যে-কোন সান্ধ্য আড্ডায় যান, দেখবেন কেউ-না-কেউ অন্য কাউকে কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের চর বলে প্রমাণ করতে বদ্ধ-পরিকর। অধ্যাপক, লেখক, ও অন্যান্য পেশাদার অথবা অপেশাদার বুদ্ধিজীবীদের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমরা শুনছি অথবা করছি যে তারা কোনও-না-কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের

ভাবধারায়, স্বার্থনিয়ন্ত্রণে প্রভাবান্বিত। এতে করে এমন এক বিষণ্ণ ও বিপজ্জনক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে যে আমরা কাউকে আর ঠিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতে পারছি না, মনে করছি বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে বুঝি আর এক ধরনের পরাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হচ্ছে, অথচ এর বিরুদ্ধে কিছু আমরা করেও উঠতে পারছি না, কেন না যে-কয়টি বিদেশী রাষ্ট্র এই বিস্বাদ পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত, তাদের অনুগ্রহের ওপর আমরা এত বেশি নির্ভরশীল যে তারা চটবে এমন সম্ভাবনাময় কিছু করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

চারটি দেশ আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত: আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মেনী এবং বৃটেন; এরাই আমাদের বুদ্ধি, ভাবনা, ভাবাবেগ ও মননের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ও আগ্রহশীল। পশ্চিম জার্মেনীর প্রধান অন্তরায় ভারতীয়দের জার্মান ভাষায় অজ্ঞানতা; তথাপি প্রতি বছর বেশ কিছু ভারতীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা আমন্ত্রণ পেয়ে পশ্চিম জার্মেনীর উদার আতিথ্য গ্রহণ করে এবং আমরা সন্দেহ করি, বুঝি-বা গৃহকর্তার মতবাদও যৎকিঞ্চিত তাদের মনে অঙ্কুরিত হয়। হাজার তিনেক ভারতীয় পশ্চিম জার্মেনিতে কারিগরী বিদ্যা শিখছে, প্রায় সবাই ভাল রোজগার করছে; এদের মধ্যে পশ্চিম জার্মেনীর ভাবধারা সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা আরও বেশি, অবশ্য যে-হেতু এরা দেশে এসে জনমত প্রভাবিত করবার মত পেশা থেকে দূরে থাকবেন সে-হেতু এদের নিয়ে বড় একটা দুশ্চিন্তা আমাদের নেই।

সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যাপার একেবারে আলাদা। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর মস্কোর প্রভাব, ইদানিং কিছুটা ক্ষীণ হলেও, প্রবল; সাম্যবাদবিরোধীরা এঁদের রাশিয়ার এজেন্ট বলতে দ্বিধা করেন না। সাম্যবাদী নয় অথচ রাশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন বুদ্ধিজীবী ভারতে অনেক; চলতি ভাষায় তাদের বলা হয়

প্রগতিবাদী। গত পনের বছরে এক হাজারের বেশি ভারতীয় লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও মনীষী সোভিয়েট রাশিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনেকের প্রবন্ধাদি আমরা পড়েছি। প্রায় তিন চার হাজার ভারতীয় এঞ্জিনীয়র রাশিয়ায় শিক্ষা পেয়েছেন, অনেকে এখনও পাচ্ছেন, এঁদের কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি সেভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থা কি গভীর ভাবে এঁদের মনে রেখাপাত করেছে, অথচ এঁদের কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ নেই। সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত (ইংরাজী সমেত) পত্রিকা ও পুস্তকগুলির বিস্ময়কর চাহিদা দেখলেই বোঝা যায় রুশ রাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় শ্রদ্ধা ও তৎসম্বন্ধে ঔৎসুক্য কত ব্যাপক। রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাবার জন্যে দিল্লীতে সম্প্রতি একটি উচ্চমান বিদ্যায়তন স্থাপিত হয়েছে যার নাম ইনষ্টিটিউট অফ রাশিয়ান স্টাডিস্। রাজনৈতিক কারণে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয়দের যাতায়াত অনেকখানি সংকীর্ণ; না ভারত সরকার না রুশ সরকার অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের রুশযাত্রায় উৎসাহী, তা ছাড়া, যে-সব কারণে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী পশ্চিম য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেতে উৎসাহী তার অনেকগুলি রাশিয়ায় অনুপস্থিত।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ওপর ইংরেজের প্রভাব এখনও প্রবলতম, যদিও দরিদ্র বৃটেন পারে না পা ফেলে চলতে আমেরিকা, জার্মেনী বা রাশিয়ার সঙ্গে, অতিথিবাৎসল্যে ; তা হ'লেও বিলেতে প্রকাশিত বই, পত্রিকা, জার্নাল, বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা, এককথায় ইংরেজের চিন্তাধারা, কৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ এখনও ভারতীয় মানসে বলিষ্ঠতম বিদেশী প্রভাব। তার অনেক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আমাদের শাসনতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী প্রথা, বিচারপদ্ধতি, আইন শিক্ষা-প্রণালী, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের সমগ্র জীবনযাত্রা, ঐতি-হাসিক ও অন্যান্য কারণে, ইংরেজের সঙ্গে শক্ত ভাবে জড়িত।

বুদ্ধিজীবীদের ওপর যে-রাষ্ট্রের প্রভাব নিয়ে বেশ কিছুদিন উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক চলছে তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিদেশী মুদ্রা, এবং খাদ্য সম্বন্ধে আমেরিকার ওপর আমরা যত বেশি নির্ভর-শীল হ'য়ে পড়ছি, তত আমাদের মনে একধরনের জ্বালা গ'ড়ে উঠছে, নির্ভরতা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ অন্তত বেশ কিছুকালের জন্যে বন্ধ বলেই আমরা মনে মনে আরও বেশি জ্বলছি, এবং, বুদ্ধি-জীবীদের ক্ষেত্রে, কেবল সবাইকে সন্দেহ ক'রে যাচ্ছি, বুঝি-বা সে ব্যক্তিগত বিত্তের অথবা উন্নতির পরিবর্তে, মার্কিন স্বার্থের অনুচর হ'য়ে বসে আছে। যদি অর্থ ও খাদ্য নিয়ে আমরা আমেরিকার মুখাপেক্ষী আরও অনেক কম হতাম, যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থকে প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের থাকত, এককালে যা অনেকখানি ছিল, এখন প্রায় নেই বললেই চলে, তাহ'লে বুদ্ধিজীবীদের ওপর মার্কিন প্রভাব নিয়ে মাথাব্যথা আমাদের অনেক কম হত। ব্যাপারটা আসলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, অথচ বেচারা বুদ্ধিজীবীকে আজ তার অনেকটা দাম দিতে হচ্ছে।

পঞ্চাশের প্রথম থেকে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে কালচারেল এক্স্চেঞ্জ চুক্তি অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের বিনিময় আরম্ভ হয়। আজ পর্যন্ত আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষালাভ অথবা শিক্ষণ অথবা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন, কারিগরী ছাত্রদের যোগ দিলে, সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কয়েকটি বিশেষ বিদ্যা-ক্ষেত্রে, যেমন ইকনমিক্স, সোস্যাল সায়ান্স, ইণ্টার-নেশনাল রিলেসন্স্, পিওর ও এ্যাপ্লায়েড সায়ান্স, স্ট্যাটিস্টিক্স্, ভারতীয় মানসের ওপর মার্কিন প্রভাব এককালে বৃটিশ প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুতপক্ষে, একশ' প্রথম-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীকে একত্র করলে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে শিক্ষা

পেয়েছেন, পড়িয়েছেন, ভ্রমণ করেছেন তার বৃহত্তম অংশ গেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাংবাদিকদের বেলায়ও তাই। লেখক ও শিল্পীদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নেই। এর প্রধান কারণ অবশ্য আমেরিকার বিপুল বিত্ত, আতিথেয়তায় বহু পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা। একমাত্র ফুলব্রাইট স্কীমেই এ পর্যন্ত ত্বহাজার ভারতীয় শিক্ষক প্রত্যেকে তুমাসের জন্যে আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন, এক হাজার মার্কিন শিক্ষক পেয়েছেন অনুরূপ ভারত-সফরের। বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশী ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে; আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারলে স্কলারশিপ জুটে যাওয়াই স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে 'অনন্ত সুযোগের দেশ' আমেরিকায় কাজের সুযোগ পেলে অর্থই শুধু অনেক পাওয়া যায় না, বেশ কিছুটা উচ্চাসনেও আরোহণ করা যায়। আমেরিকায় ভারতীয় পড়াবার সুযোগ পায় প্রতি বছর কুড়ি থেকে পঞ্চাশ জন ভারতীয়, এবং এঁদের অনেকেই সুনাম ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। একাধিক ভারতীয় যথা, ডাঃ চন্দ্রশেখর (বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নন)—আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতম পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এখন, বিতর্ক ও সন্দেহ ঘনিয়ে উঠেছে যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তা হল: মার্কিন দাক্ষিণ্য গ্রহণের বিনিময়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মার্কিন স্বার্থের অনুচর হ'য়ে উঠছেন কিনা। এ প্রশ্ন জটিল হয়েছে সাম্প্রতিক সি. আই. এ. ঘটিত চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনে। যে সন্দেহ বহু মানুষের মনে অনেককাল ছিল টুকরো অন্ধকার, আজ তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, কয়েকটি মার্কিন সংবাদপত্রেরই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। জানা গেছে সি. আই. এ-র টাকা অজানা অচেনা পথে অনেক প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে উপনীত যে সব প্রতিষ্ঠান প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কাজ করে, অথবা ছাত্র-যুবক সম্প্রদায়, সংঘবদ্ধ যুবক ও শ্রমিকদের নিয়ে। জানা গেছে ভারতবর্ষে কর্মনিযুক্ত

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এমন সব মার্কিন সংঘ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে আসছে যারা সি-আই-এ বদান্যে পরিপুষ্ট। জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান ও সংঘের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে বেশ কিছু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মার্কিন মুলুকে ভ্রমণ করেছেন অথবা চাকরী করেছেন। যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সাংবাদিক, এঁরাও বাদ যান নি। জানা গেছে এশিয়া ফাউণ্ডেশন এমন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ পান যারা সি-আই-এ-র দাক্ষিণ্যপুষ্ট; অতএব, প্রেস ইন্‌স্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ইনটারনেশনাল রিলেসন্‌স্ এশিয়া ফাউণ্ডেশনের সাহায্য আর নেবেন না সিদ্ধান্ত করেছেন।

যে বিষয়টি আমাদের স্থিরবুদ্ধিতে ভেবে দেখতে হবে তা হল: মার্কিন আতিথ্য গ্রহণ করলেই আমরা মার্কিন স্বার্থের অনুচর হই কি না। পৃথিবীতে এমন দেশ বোধকরি একটিও নেই যার কিছু না কিছু লোক বিদেশের অনুচর বা স্বার্থপোষক, যে-কারণেই হোক না কেন, টাকার লোভে অথবা প্রত্যয়ের তাড়নায়। সাম্যবাদীরা রাশিয়া বা চীনের স্বার্থ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব করবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের দেশে এমন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি থাকবেই যারা হয় মার্কিন নয় রুশ নয় চীন মতবাদ এবং জাতীয় স্বার্থের সমর্থক কিংবা তৎপ্রতি পক্ষপাতী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মার্কিন বা রুশ (এমন কি চীন, এবং পাকিস্তান) স্বার্থের সঙ্গে, আমাদের জাতীয় স্বার্থের মিল আছে অথবা হ'তে পারে; আমেরিকান কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ জর্জ কেনানের ভাষায়, কোনও দেশ অন্য কোনও দেশের পরিপূর্ণ মিত্র বা শত্রু নয়; যে পরম মিত্র তার মধ্যেও বৈরীতা লুকিয়ে আছে, যে পরম শত্রু তার সঙ্গেও মিত্রতা অসম্ভব নয়। অতএব, গণতান্ত্রিক ও মিশ্র-শ্রেণী (Plural) ভারতবর্ষে নানা মতামত, প্রত্যয়, বিশ্বাস আছে, থাকবে, থাকা উচিত। অর্থাৎ কেউ যদি ভীয়েৎনামে মার্কিন ভূমিকা সমর্থন করে তাকে এক কথায় আমেরিকার দালাল বললে অবিচার হ'তে পারে

কারণ তার সত্যিকার প্রত্যয় জন্মান অসম্ভব নয় যে চীনকে আমেরিকা যদি ভীয়েৎনামে আটকে না রাখত, তাহলে তার প্রাধান্য বর্মা পর্যন্ত পড়ত ছড়িয়ে। আমি এ-ও বলব যে চীনের কোনও কোনও নীতি বা কর্মপন্থার প্রশংসা না করতে পারার মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ প্রচ্ছন্ন, তা বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী। আমার প্রধান বক্তব্য হল: অতি সহজে আমরা একে অন্যকে হীন, সুবিধাবাদী, কম-দেশপ্রেমিক, অসৎ অপবাদ দিয়ে বসি, কেন না পারস্পরিক শ্রদ্ধা আমাদের কম, কেন না নিজেদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান আমরা নই।

এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মার্কিন সাহায্য ছাড়া অনুশীলন সংগঠন ভারতবর্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে ধরুন প্রতিরক্ষা-অনুশীলন, defence and strategic studies, যুদ্ধ যদি সত্যি এমন গুরুতর ব্যাপার যা সেনাপতিদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাহলে ভারতবর্ষে সমরনীতি ও সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমঝদার মানুষ তৈরী করতে হবে; মনে রাখতে হবে যে সমরবিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থনীতি, ভৌগলিক-রাজনীতি (geo-politics) ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পদসঞ্চারে বিদেশী সাহায্য অপরিহার্য, এবং সে সাহায্য, ভাষা ও প্রতিরক্ষানীতির প্রয়োজনে, গ্রহণ করা সম্ভব প্রথম প্রথম একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকা থেকে। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের পাঠাতে হতে হয় লণ্ডনের Institute of Strategic Studiesএ (যা মার্কিন সাহায্যে পরিপুষ্ট), তা নয়তো অনুরূপ কোনও মার্কিন বিদ্যালয়ে। শিক্ষাশেষে দেশে ফিরে এসে এরা যখন কাজকর্ম শুরু করবে তখন প্রথম প্রথম বিদেশী প্রভাব এদের ওপর থাকবেই। কয়েক বছরের ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার পরে এরা মূলত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা সমস্যা ও সমরনীতি বিচারের ক্ষমতা লাভ করবেন। অথচ প্রথম থেকেই যদি আমরা এদের মার্কিন দালাল মনে ক'রে নি,

তাহলে এদের কাছে না পাবো প্রত্যাশিত কাজ, না থাকবে এদের মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস। এ কথার উল্লেখ করছি এ-জন্যে যে ভারতবর্ষে পাকিস্তান সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ, শ্রীশিশির গুপ্ত মশাইর বিরুদ্ধেও বামপন্থী পত্রিকায় মার্কিন প্রভাবের দোষারোপ দেখেছি, শুধু এই অপরাধে যে তিনি সম্প্রতি London School of Economics-এ বৎসরকাল সামরিক সমস্যা অধ্যয়ন করে এসেছেন।

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কথা বলা যাক। এদের অনেকে মার্কিন, জার্মান, ব্রিটিশ ও রুশ আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন, করছেন, করবেন। তাতে আমাদের সাহিত্য শিল্পের উপকার হবারই সম্ভাবনা। সাহিত্যিকদের মন ও চেতনা বিদেশ-ভ্রমণে অথবা প্রবাসে যদি সঞ্জীবিত, প্রসারিত, সূক্ষ্মায়িত হয়, সাহিত্যের লাভ। ভেবে দেখুন, একমাত্র বাংলা সাহিত্যেই বিদেশের সংস্পর্শে এসে আমরা কত বিচিত্র স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। পূর্ব-সূরীদের কথা বাদ দিয়ে, হাল-আমলে অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, তরুণ মিত্র, শম্ভু মিত্র, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মায় (মাপ করবেন) চাণক্য সেন কি বিদেশ-ভ্রমণ অথবা প্রবাসে বাংলা সাহিত্যে নতুনের স্বাদ আমদানী করেন নি ? বুদ্ধদেব বসুর কথাই এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেন না পরিণত বয়সে মার্কিন প্রবাসও তাঁর কবি-মনকে যে-ভাবে উৎসারিত করেছে, ক্ষীণতেজ ভারতীয় জীবনে তা দুর্লভ। আমেরিকায় প্রবাসকালীন এবং দেশে ফিরে আসার পর বুদ্ধদেব বসুর রচিত কবিতায় আমরা আশ্চর্য নতুন আস্বাদ পেয়েছি, সূক্ষ্ম অনুভূতির, বিরাটতর সংবেদনার, পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর মূল্য-সংঘাতের। গতবারের শারদীয় সাহিত্যে যেটুকু নতুনত্ব তিনি দেখাতে পেরেছেন তার মূলেও বিদেশ-প্রবাসের অনুভূতিশীল অভিজ্ঞতা। বুদ্ধদেব বসুর কোনও রাজনীতি আছে বলে আমার জানা নেই, মার্কিন আতিথ্য তাঁকে pro-American করেছে

একথা আমি বিশ্বাস করি নে যদিও তাঁর মত মানুষের পক্ষে গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি লোকায়ত নীতির প্রতি বিশ্বাসই আমি প্রত্যাশা করি, অর্থাৎ, আমার ধারণা, তিনি চিরকালই কম্যুনিজম্-এর অসমর্থক।

আমার নিজের কথা একটু বলি। আমি মাত্র কয়েক মাসের জন্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম ১৯৬৩ সালে; তার প্রভাব পাঠকরা দেখবেন 'তিন-তরঙ্গে' এবং আমার আগামী উপন্যাসে। হার্ভার্ডের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরী কিসিংগার একদিন প্রাতরাশে বসেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে, আলাপের মধ্যে ভারতবর্ষের কথা উঠেছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু যারা ছিল তাদের একজন আমাকে বলেছিল ডাঃ কিসিংগারের ভারত সম্বন্ধে অভিমত: 'এদের চরিত্র আছে, এরা ভাঙবে, কিন্তু নত হবে না। ('The Indians will break, but they won't bend.')'

সে ছিল ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাস। তখন আমাদের জাতীয় চরিত্রে আশ্চর্য এক বল ছিল, পৃথিবী তাকে সম্মান করত। সে বল যদি আজ শোচনীয় ভাবে কমে গিয়ে থাকে, যদি আমরা আজ অতি সহজে নত হ'তে তৈরী, তার প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব হঠাৎ অত্যন্ত কমজোর হ'য়ে যাবার জন্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেছে, এবং এ-কারণেই আমাদের অন্তর্জাতিক প্রতিকৃতি আজ আর গর্ব করার মত নেই। বুদ্ধিজীবীদের দোষ নেই একথা কেউ বলবে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে সুস্পষ্ট নির্ভীক মতবাদ প্রকাশে বুদ্ধিজীবীরা আর তৎপর নন। আমি অবাক হয়ে ভাবি ইজরাইল নিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের যে পরিমাণ দরদ সম্প্রতি দেখতে পেলাম, উত্তর ভীয়েৎনাম নিয়ে তার একাংশও কেন দেখা গেল না? 'ঘেরাও'

বলুন কিংবা অন্য কোনও বড় জাতীয় প্রশ্ন বলুন, রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদপত্রের ওপর সবটুকু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা এক বিরাট আত্মবিলাসে মাথা-লুকিয়ে আছেন, ভাবতে কেমন আমার ভয় হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ব্যাপক হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠস্বর বা লেখনী চালিত হচ্ছে না। অথচ যে-সব হুজুগে মাঝে মাঝে বুদ্ধিজীবীরা জড়িয়ে পড়ছেন তার মধ্যে রাজনীতির উগ্র গন্ধ, এবং অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে, আমার মতে, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন এডুকেশনাল ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের 'আন্দোলন' আমি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বলে মানতে পারি নি। তার মানে এই নয় যে প্রস্তাবিত ফাউণ্ডেশনের নিয়মকানুন আপত্তিজনক ছিল না; ছিল। এবং নিয়মকানুনগুলিকে সংশোধন করে নিয়ে একটা বিরাট পরিমাণ অর্থ আমাদের শিক্ষাপ্রথার উন্নয়নে নিয়োগ করাটাই আমার কাছে সমীচীন মনে হয়েছিল। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও শিক্ষায় আমরা জাতীয় আয়ের মাত্র তিন শতাংশ ব্যয় করতে পারছি, এবং শিক্ষার অবয়বিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মান ক্রমাগত বিপজ্জনক ভাবে নেমে যাচ্ছে। আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্য সাহায্যের চেয়ে বিজ্ঞান, টেকনলজি এবং বিশেষ বিশেষ সমাজ-বিজ্ঞানে শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তার ও উন্নয়নের জন্যে সাহায্য গ্রহণ আমি অনেক প্রিয় মনে করি।

বস্তুতপক্ষে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ কেমন যেন জগা-খিচুড়ি হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত বিত্ত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা: এই হল ভারতীয় সমাজে আজ প্রাধান্যের মাপ-কাঠি। বিদেশ ঘুরে আসা, বিদেশে শিক্ষা আমাদের সামাজিক সম্মান বাড়িয়ে দেয়, বিদেশ মানে এশিয়া-আফ্রিকা নয়! কার দেহে কি বিদেশী আবরণ বা আভরণ, কার গৃহে কতগুলি বিদেশী গ্যাজেট, এই হল সামাজিক সম্মানের পরিচায়ক। এ মূল্য-বিভ্রাটে বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয় সাহায্য

করেছেন, কিন্তু এর প্রধান দায়িত্ব জাতীয় জীবনের কর্ণধারদের। গান্ধীযুগের জীবনায়ন বর্তমান ভারতবর্ষে অনুপস্থিত, আমরা সমাজতন্ত্রের নামে এক অদ্ভুত তন্ত্র তৈরী করেছি যেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাত (Cast) এবং আঞ্চলিক স্বার্থ প্রধান , সবার ওপরে হল ব্যক্তি-স্বার্থ ও ব্যক্তি-সম্পদ। বুদ্ধিজীবীদের অপরাধ তাঁরা এ স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টাও করেন নি। ব্যক্তিগত বিত্তের আস্বাদ প্রতিবাদকে নিহত করেছে, বিবেককে দুর্বল ও মৌন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের তো কোনও স্বকীয় শ্রেণী-সত্ত্বা নেই ইতিহাসে, তারা establishment-এর সঙ্গে চলতেই অভ্যস্ত —একমাত্র বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে তাদের দল-বাছার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। সে পরিস্থিতি ভারতবর্ষে অনাগত, ভবিষ্যতে আসবে কিনা সন্দেহজনক। ইতিমধ্যে যে মনোভাব বুদ্ধিজীবীদের সর্বনাশ করছে তা হল পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, মস্তিষ্কের ধারাবাহিক আলস্য, কোনওমতে কিছু বিত্ত এবং কিছু সুখ্যাতি গুছিয়ে নেবার তৎপরতা। জনসাধারণও এ দারুণ রোগকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, এক দিকে বিনা প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের হাত থেকে মনের অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণ ক'রে, অন্যদিকে অতি সহজে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা হারিয়ে। জাতীয় পরিক্রমায় নতুন দিকদর্শন না আসা পর্যন্ত এ অবস্থার সংশোধন আমি প্রত্যাশা করতে পারি নে।

এবারকার মেলব্যাগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠক-পাঠিকারা এমন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, সাহিত্যের দিক থেকে যার মূল্য যথেষ্ট।

কানপুর থেকে কুমারী পুষ্পদল ভট্টাচার্য নতুন লেখকদের দুটি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করেছেন, যাতে ক'রে বাংলা দেশের বর্তমান সাহিত্যিক পরিস্থিতি যে কি অসম্ভব দূষিত তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'বিখ্যাত মাসিক পত্র' যখন

'অখ্যাত লেখকের' লেখা ছাপে তখন না পাঠায় complimentary copy, না লেখেন একখানি পত্র ; যদি এ অভিযোগ সত্যি হয়, পত্রিকাদের এই অভদ্রতার বুঝি নজীর নেই অন্য কোথাও। 'চিঠির উত্তরও পাওয়া যায় না এঁদের কাছ থেকে।' পুষ্পদলের অন্য অভিযোগ আরও গুরুতর। 'অনেক সময় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, নতুন লেখক-লেখিকাদের উপন্যাস বিখ্যাত পত্রিকায় ছাপান হবে, অতএব প্লট ও কিতাবের নাম পাঠান। বছর ৮।৯ আগে আমি এই রকম একটি বিজ্ঞাপনে ঠকেছি। আমি তখন প্রথম উপন্যাসটি সবে লিখতে আরম্ভ করেছি। উপন্যাসের একটি আকর্ষণীয় নামও ঠিক করেছিলাম। বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি নাম ও প্লট লিখে পাঠালাম। তারপর বিজ্ঞাপনদাতারা (Box No. ছিল) একেবারে নীরব। পত্রোত্তর না পেয়ে যখন উপন্যাসটি একটি পত্রিকায় ছাপতে দিলাম সে সময় একজন বিখ্যাত লেখকের একটি বইএর বিজ্ঞাপনে দেখলাম হুবহু আমার উপন্যাসের নাম। বইটি অনেক চেষ্টা করেও যোগাড় করতে পারিনি, পেলে প'ড়ে দেখতাম আমার উপন্যাসের প্লটও তিনি নিয়েছেন কি না।' এ অভিযোগ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য হল : এক নাম হওয়াটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অসম্ভব নয়, নীহার গুপ্ত ও প্রবোধ সান্যালের দুখানি উপন্যাসের দেখছি নাম এক : 'পিয়ামুখচন্দা' ; 'তিন তরঙ্গ' নামে একটি বই সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকৃত হ'য়েছে, যা চাণক্য সেনের রচিত নয়। কানপুর প্রবাসিনীর অভিযোগ উদ্বেগজনক এ জন্যে যে বক্স নং দিয়ে বিজ্ঞাপন করতঃ যাঁরা নতুন লেখকদের উপন্যাসের নাম ও প্লট সংগ্রহের পরে আত্মগোপন করেন, তাঁরা কারা, কি তাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের সঙ্গে কি অন্য কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখকরা জড়িত ? বাংলা দেশে কি এমন কোনও ব্যক্তি আছেন যিনি এ ব্যাপারটা অনুসন্ধান ক'রে দেখতে পারেন ? প্রতারিত লেখক-লেখিকারা কি পুলিসের কাছে চিঠি লিখে দেখেছেন ?

গরচা ফার্স্ট লেন থেকে দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বাঙালী সাহিত্যিকদের কলকাতা-প্রীতি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা পড়ে খুব ভাল লাগল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার মত সঠিক, তবে যে ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে মেলেনি সেইটা উল্লেখ করেছি। প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের রচনাতে পর্যন্ত কলকাতার প্রাধান্য এবং তাঁদের বাসস্থানের পরিবেশ সাহিত্যে স্থান পায়নি। অন্যান্যদের সঙ্গে বিভূতি মুখোপাধ্যায়কেও এই পর্যায়ে ফেলেছেন। এটা কিন্তু আপনার অনবধানতা। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের রচনায় কলকাতা কখনই প্রাধান্য পায়নি। খাস কলকাতা খুবই অল্প আছে। বৃহত্তর কলকাতা অবশ্য কিছু বেশি আছে বিভিন্ন ছোট গল্পে, তবে সমগ্র রচনা সম্ভারের তুলনায় তা কিছু মারাত্মক নয়। বরং সেটুকু না থাকলে একটা বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র গুলি বাদ পড়ে যেত। এত ব্যাপকভাবে তিনি মনুষ্য-চরিত্রের অনুশীলন করেছেন যে কোনও বিশেষ স্থান, বিশেষ বয়স, বা বিশেষ শ্রেণী প্রাধান্য দাবী করতে পারে না। তদুপরি তাঁর নিজের বাসস্থানের পরিবেশ তাঁর প্রচুর ছোট গল্পে স্থান পেয়েছে। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র দ্বিতীয় খণ্ডটি তো পুরোপুরিই মিথিলার ঘটনা।'

কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকদের নিয়ে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন। নিউ দিল্লী থেকে অনিরুদ্ধ চৌধুরী বিমল করের সাহিত্যকৃতি নিয়ে 'বিরাট পরিসরে' আলোচনার দাবী জানিয়েছেন ; এ কাজের যোগ্যতা আমার নেই, আমি বিমল করের সব উপন্যাস পড়িনি। অনিরুদ্ধ চৌধুরীর মতে বিমল কর 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জনক', এবং 'আধুনিক গল্পকারদের ভাষা ও স্টাইলের পিতামাতাও তিনি।' এ মন্তব্যের মধ্যে যে অতিশয়োক্তি আছে, তা মার্জনীয় এজন্যে যে বিমল কর দীর্ঘকাল সাহিত্যকর্মের পর এখন স্বীকৃতি লাভ করছেন, এর মধ্যে

পাঠক মনের যে স্বাগত সুস্থ-চেতনা লক্ষণীয়, অনিরুদ্ধ চৌধুরীর বিশেষণ তার প্রমাণ বহন করে। তাঁর অন্য মন্তব্য, 'বিমল কর যথেষ্টভাবে স্বক্ষেত্রে অরিজিন্যাল', আমি সমর্থন করব, সঙ্গে এও বলব যে বর্তমান গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে তিনি সযত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর প্রতিটি রচনায় স্বাতন্ত্র্য আছে, যা আজ-কালকার বাজারে কম কথা নয়, এবং তিনি কোনও চটকদার টেকনিক কিংবা বিষয়বস্তু দ্বারা প্রলুব্ধ হননি। শুধু তাই নয়, বিমল করের ভাষা নিরুত্তাপ, নিরুচ্ছ্বাস ক্ষুরধার, এক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী, আমার ধারণা। গৌহাটি থেকে চন্দনকুমার ভট্টাচার্যও বিমল করের সাহিত্যকৃতি অনুধাবনের প্রয়াস করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে শ্রীকর যে এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থান দখল করেছেন, তা তাঁর উৎকৃষ্ট উপন্যাস 'খড়কুটো'র জন্যেই। কৈশোর প্রেমের পরিচ্ছন্ন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই হয়।'

জলপাইগুড়ির চালসা থেকে দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়:

'সমরেশ বসুর 'বিবর' যে আলোড়ন এনেছে, যা পড়ে আমাদের বর্তমান সাহিত্যিকরা 'অশ্লীল' রবে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তা আমি একান্ত কৌতূহল আর মনোনিবেশ সহকারে পড়েছি, বুঝেছি, কেন এই চিৎকার। বারবার মনে হয়েছে, কে যেন কবে বলেছিল: সত্য সর্বদাই অপ্রিয়। তাই সমরেশবাবুর 'বিবর'-এর শুরুর কথাটি কিছুতেই ভুলতে পারিনি '···আমরা সবাই যদি সত্যি কথা বলতে পারতুম।' উত্তর বাংলায় গত সাহিত্য সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। 'বিবর'-এর ওপর বিতর্কমূলক আলোচনাও হয়েছিল যাতে বহু সাহিত্যিক স্বচ্ছন্দে 'বিবর'কে 'অশ্লীল' শ্রেণীতে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সভাপতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবরের' সপক্ষে সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিচার আমার ভাল লেগেছে। যখন আমরা বিশেষ ভাবে 'এ' মার্কা ছবিগুলি দেখতে মরিয়া হয়ে উঠি তখন

অশ্লীলতা কি বাক্স-বন্দী করে রেখে আসি ? তেমনি ভাবেই, যারা 'বিবরের' দুর্নাম গাইছেন তারাই বোধকরি বারবার বইটি পড়েছেন সঙ্গোপনে। তবে দীপক চৌধুরীর 'নেশা' যে 'বিবরের' পথ বেয়ে এসেছে এটা বেশ বোঝা যায়। এটুকুই প্রমাণিত যে, যাঁরা এতকাল লিখতে-বলতে ভয় পেতেন, তাঁরা আজ লিখবেন।'

এতদিন পরে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে আমি একখানা সুচিন্তিত সুলিখিত পত্র পেয়েছি, যাকে কেন্দ্র করে আলোচনার আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের সবাইকে। কলকাতার অশোক এভিনিউ থেকে দীপালি দত্তরায় লিখেছেন ঃ

'বুদ্ধদেববাবুর প্রথম দিককার সৃষ্টি (কল্লোলযুগ ও তারপরের বেশ কিছুটা পর্যন্ত) সম্বন্ধে আমার খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবে তাঁর প্রথম দিককার লেখা যতটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, তিনি অত্যন্ত সেনসুয়েল লেখক। একজন কবির কাছে যা পেয়ে মনকে মানাতে পারি, একজন পুরোদস্তুর সাহিত্যিকের কাছে কেবল মাত্র সেটুকু পেয়ে অবশ্যই মন ভরে না। তাঁর জ্ঞান, তাঁর বিদ্যা ও বিদগ্ধতার মধ্যে কোথায় একটা অসম্পূর্ণতার অভাব মনকে পীড়া দিয়েছে। তাঁর মর্ডানিজম বলিষ্ঠ ঠিকই, কিন্তু আমাদের এই প্রাচ্য দেশের রীতিনীতির সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়ার অভাব ছিল। প্রাচ্য মানেই সবকিছু প্রাচীন, অতএব পরিত্যজ্য একথা আমি মানি না, যেমন মানি না এগিয়ে যাওয়া মানেই সবকিছু ফেলে এগিয়ে যাওয়া। সে প্রগতি একক, অতএব খুব নির্ভরযোগ্য নয়। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে বোঝাপড়ার, নীতিগত ধরাছাড়ার কারণ-গত সাম্যতা থাকলে তা সহজে সকলের গ্রহণযোগ্য হয়। বিদেশী কবি বা লেখকের কাছে আমরা যা পাই তা আমাদের বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু আমার দেশের সাহিত্যিকের কাছে আমার একটা দাবী আছেই। সে দাবী 'আমাকে বোঝাও, আমাকে মানাও' নয়, বরং 'আমাদের জন্য লেখ, আমাদের

তুলে ধর, তোমার ঊর্ধ্বগতির টানটা আমাদের প্রাণে এসেও লাগুক।'

সর্বাঙ্গীন ভাবে তাঁর যে বই আমার প্রথম ভাল লাগল, তা 'তিথিডোর'। তাঁর যৌবনকালের সমস্ত সেনস্যুয়ালিটি ছাড়িয়ে হঠাৎ তিনি প্রায় নীরবে একসঙ্গে অনেক পথ পেরিয়ে এসে 'তিথিডোরে' পৌঁছলেন। এ পরিবর্তন বিস্ময়কর, মনোমুগ্ধকর। একটা উল্লসিত লুণ্ঠক মশাল যেন হঠাৎ প্রদীপে পরিণত হল। স্তিমিত মাটির প্রদীপ নয়, উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রদীপ। 'তিথিডোর' বড় সুন্দর, বড় করুণ। জীবনের অনেকগুলি সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষাব অন্তত একটিমাত্রও অন্যতম আশার সুন্দরতম হয়ে ফুটে ওঠার সুদীপ্ত আশ্বাস। 'তিথিডোর' তাঁর এক অপরূপ নির্মল ও আকুল নতুন চেতনা। এ সময়টি থেকে তাঁর মন নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

এরপর 'শ্যেনপাংশু'। অপূর্ব। নামটাই কাব্য। এতে, নতুন ব্যক্তিত্ব নতুন মার্যাদা নিয়ে যেন তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আগেকার রচনাতে যা পাইনি তা পেলাম এতে। বিশ্বাসের দৃঢ়তা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা খুঁজে পেলাম। এর আগে তিনি যেন তাঁর মন ও ক্ষমতার সঙ্গে ফ্লার্ট করে আসছিলেন, 'তিথিডোর' থেকে তাঁর উত্তরণ শুরু হল। নিজের লেখাকে, নিজের মনকে শ্রদ্ধা করলেন, ভালবাসলেন। পায়ের নিচে শক্ত প্লাটফর্ম খুঁজে পেলেন। এ প্লাটফর্ম পাঠকের উন্নত দৃষ্টির লেভেলে-এ বাঁধা।

'কিন্তু তারপর আবার কোথায় ডুব মারলেন তিনি। আমার মনে হয় বাংলাদেশের সমগ্র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে যদি কেউ সত্যি-কারের মুডী লেখক থেকে থাকেন তবে তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বসু। একাধারে শিশুর সারল্য, বালকের কৌতূহল ও চাকচিক্য-প্রিয়তা এবং প্রাজ্ঞের গভীরতার এককালিন অবস্থিতি বোধকরি এই একজন লেখকের মধ্যেই বর্তমান। তাই তাঁর মধ্যে নেই

ফ্রাস্ট্রেশন; নেই দুঃখবাদীতা। তাঁর পাঠকবর্গের সঙ্গে কোনও কালে কোনও অব্লিগেশন-এ তিনি বাঁধা নন। এ এক আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ বিহার। এ ক্ষেত্রে তিনি একজন সত্যিকারের শিল্পী। তাই তাঁর রচনার বিষয়ও এত বৈচিত্র্য ও কর্মবহুল।

তাঁর শারদীয় 'পাতাল থেকে আলাপ', 'বাবু ও বিবি' এবং সর্বোপরি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' একই সময়ে একই লেখকের কলম থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে এত সার্থক ভাবে বেরিয়ে এসেছে ভাবতে বিস্ময় জাগে। মনে হয় কেমন করে তা সম্ভব? কিন্তু তারও জবাব বোধকরি ঐ একটি কথাই, তিনি একজন খাঁটি শিল্পী।

'পাতাল থেকে আলাপ', 'বাবু ও বিবি' এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' আপাত-দৃষ্টিতে যতই সর্বতোভিন্ন হোক না কেন, আমার মনে হয় তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছেই। তিনটি যেন একই মানব জীবনের তিনটি অংশ। মানবের এই দেহ ও তার সমস্ত ক্ষমতার অসারতা, মানবের দেহ ও মন উভয়েরই ক্ষুদ্রতার সীমা এবং এই দেহ এই মন হোক ক্ষুদ্র, হোক লাঞ্ছিত, তার প্রতি দৃক্পাতহীন আত্মার উন্মার্গতা।

'পাতাল থেকে আলাপে'র নায়কের সমস্ত পরিচয় তার দেহ। তাই সে পরিচয় সাধারণের চোখে ভাস্কর জ্যোতিতে ভাস্বর হলেও, তার বিদায়ক্ষণে দেখা যায় না কোনও সহানুভূতির রামধনু। আপন রক্ত-মাংসের নেশায় বিভোর ব্যক্তির জীবনাকাশ স্বভাবতই কোনও প্রেম ও প্রীতির মেঘে আর্দ্র থাকে না। হয়তো বা তার অতিরুদ্রতার রুক্ষতম ক্ষমতা কোনও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকায় ফাটল ধরিয়ে তার গোপনতম ক্ষমাশীল সরসতার উৎসমুখটিকে উন্মোচিত করতে পেরেছে—এবং সেই তার আপাতসার্থক মূলত ব্যর্থ জীবনের করুণ সার্থকতা।

কিন্তু এ তো দরদী লেখকের সমবেদনা মাত্র! অনাহূত ঐ কয়বিন্দু অশ্রুতো লেখকের ক্ষমার স্বাক্ষর। এই অশ্রু কি এই

কথাই বলেনি যে, 'তুমি যা তুমি তাই, এর বেশি কিছু করতে পার নি বলে পৃথিবী তোমায় প্রতি পদে শাস্তি দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।'

তারপর 'বাবু ও বিবি'। মানবদেহ তার নিজের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত। একটি মিজেট্‌ও নিশ্চয়ই তার নিজের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাতই হবে। কিন্তু সংসারে সাধারণত মানুষের মাপ নির্ণীত হয়, তার পার্থিব ক্ষমতার পরিমাপে। মানুষ তার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন নিয়ে যত কিছুই সৃষ্টি করে চলুক না কেন, বাস্তব সংসার সে সমস্তকে তার উপরি পাওনা হিসেবেই ধরে নেয়, কিন্তু তার মূলের দাবীটুকু ছাড়ে না। আমূল পরিবর্তন যদি তার পক্ষে হয় অসম্ভব, তবে সে বাতিল। তার সব সৌন্দর্য, সব অনুভূতি নিয়েও সে 'সারপ্লাস', তাই পরিত্যজ্য। পরিবর্তনের স্রোতে, কালের যাত্রায় সে এগিয়ে আসতে না পারলে, 'ক্রাশ্‌ড' হতে বাধ্য। ঘোড়ার সিম্বলটি ভারী সুন্দর। আজকের এ বিশ্ব-মেলায় অসংখ্য কর্মবীরের ঘোড়ার পায়ের চাপে এমনি কত শত ছোট আশা, ছোট স্বপ্ন, ছোট ক্ষমতার ছোট ছোট মানুষেরা লোকচক্ষুর আড়ালে এমনিভাবে পিষে মরছে কে তার হিসাব রাখছে? বিবিদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কি করে বলুন? সুর বাঁধার চেয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নই যে তারা জন্মক্ষণে সঙ্গে নিয়ে আসে সাধারণত।

একটি শিল্পীমন যে সংসারের চোখে এমনিভাবে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপ নিয়ে এত করুণ এত অসহায় অবস্থায় পিষে মরে, আগে কখনো ভাবিনি। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই তো ঠিক এমনি ধরনের মিজেট। আমাদের এই ছোট দেহের অক্ষমতার গণ্ডীতে, মনের একমুখী গতির অপরিসরতায়, সাহসহীনতার যতির সীমানায় বাঁধা হাস্যকর পুতুলমাত্র। এ বিলাপের সুর কেন ধরিয়ে দিলেন মনের মধ্যে বুদ্ধদেববাবু? তাঁকে ক্ষমা করা যায় কি?

যায়। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' পড়ে শুধু ক্ষমা করাই সম্ভব নয়, ক্ষমা চাওয়াও সম্ভব।

বুদ্ধদেববাবুকে সেনসুয়াল বলেছিলাম না? কিন্তু এক বারাঙ্গনার দেহ যুবতীর মনকে ছাপিয়ে, একি অত্যাশ্চর্য এক আত্মার বিকাশ তিনি দেখালেন? সেনসুয়ালিটির উচ্ছ্বসিত পথ বেয়ে এসে একি অভাবনীয় মুক্তিদ্বার খুললেন তিনি? শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শময় এ জগত ছাড়িয়ে একি আকস্মিক উদার আকাশচারণ? এই মানবদেহের সুখ দুঃখ আবেগ আশ্লেষ থেকে মুক্ত এ অদ্ভুত উন্মার্গযাত্রা মনকে অভিভূতই করে শুধু। জ্ঞানের বসন কত ঘনীভূত হলে অজ্ঞানের মুক্তিতে এমন আনন্দ আসে জানতে ইচ্ছা করে। লক্ষ্য স্থির হলে বুঝি বা পথ এমনি আপনিই সামনে খুলে যায়। জ্ঞানের নিঃসীম মুক্ততার ডাকে অজ্ঞানের অকুণ্ঠ রিক্ততাই এপথের পাথেয় মাত্র, একথা অনেক আগে আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের ঋষিরা বলেছেন, কিন্তু এভাবে এমনি এক অ-প্রস্তুত পাঠকমণ্ডলীর কাছে শারদীয় সাহিত্যের মাধ্যমে?

তাঁরই ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানাই 'সিক্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।'

দিপালী দত্ত রায়ের সুলিখিত মন্তব্যে ভাবের উচ্ছ্বাস একটু বেশি, বিশেষণের কিছু অতিরিক্ত বিতরণ; তথাপি তাঁর সঙ্গে আমি একমত প্রধান বিষয়েঃ বুদ্ধদেব বসুর বহুমুখী সাহিত্যিক প্রতিভা, তাঁর শিল্পীমনের বিস্ময়কর কর্মপ্রবণতা। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনা করলেই এ কথার যাথার্থ প্রমাণ হবে: পাঠকদের চমকে দেবার, অনাস্বাদিত অনুভূতির আস্বাদ দেবার ক্ষমতা কল্লোলযুগের লেখকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেবেরই আছে। বর্তমান আলোচনার প্রথম অংশে বলেছি তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় নতুন বিষণ্ণ গভীরতা ও সংবেদনশীলতার কথা। 'বাবু ও বিবি', আমার কাছে, এক আশ্চর্য রচনা, এ কালের উপযুক্ত লেখা, যা

রচনার যোগ্যতা, বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বুদ্ধদেবেরই আছে। 'পাতাল থেকে আলাপ', আমার মতে, অসার্থক উপন্যাস যদিও এর ভোগ-বলিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ আকর্ষণীয়, এতে অন্যান্য বর্তমান লেখকদের যৌন-ঘ্যানঘ্যানানি নেই, যদিও উপন্যাসের মধ্যে নাটকসুলভ ডায়ালগ নিয়ে আসার টেকনিক যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। যেখানে উপন্যাসটি ব্যর্থ তা হল: গলার ক্যানসারে মুমূর্ষু একটি মানুষের আত্মচিন্তার ধারাবাহিক কাব্যিক সূচনা: পচা-গলা দেহের এমন সামগ্রিক অস্বীকার কি ক'রে সম্ভব আমি বুঝতে পারিনে। যে লোকটি গলার ক্যানসারে আজ নয় কাল মরবে তার চিন্তাধারা, 'আলাপের যদি এই রূপরীতি, তাহ'লে আর কিছু বলার থাকে না। অতএব, পুরো উপন্যাসটাই, আমার কাছে, ভুল কাঠামোয় দাঁড়ান মনে হয়েছে। 'রাত ভর বৃষ্টিতে বুদ্ধদেব বসু 'ওটা হ'য়ে গেল' দেখিয়ে চমক লাগিয়েছেন, কিন্তু আসলে কাহিনীর মধ্যে বা গল্প-বিন্যাসে সাবেকী সংবাদ, শুধু ব্যতিক্রম হল, যে জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ, পরিণত বয়সে তিনি বলিষ্ঠ পৌরুষের সন্ধান পেয়েছেন। ঈশ্বর জানেন, সমগ্র বঙ্গ উপন্যাস পরিক্রমায় ডজন খানেক বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্রের সন্ধান মিলবে কি না সন্দেহ; মার্কিন সাহিত্যের মত, বাংলা সাহিত্যেও, বোধকরি একটা অজানা anti-hero tradition বর্ধিত হয়েছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' মর্মপর্শী কাব্য সন্দেহ নেই, কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর এই রূপক অতীত-অবগাহন থেকে 'বাবু ও বিবি' আমার কাছে বেশি সংবেদনপূর্ণ। কারণ, সবচেয়ে দুর্বোধ্য, অবাধ্য, অপরিহার্যকাল হল বর্তমানকাল, বর্তমানকে এড়িয়ে সৃষ্টিশীলতা, আমার মতে, অমার্জনীয় অপরাধ।

— এই লেখকের অন্য বই —

মুখ্যমন্ত্রী ॥ চাণক্য সেন

উদয়াচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। এ কাহিনী তাঁর মুখ্যমন্ত্রী-জীবনের সংকট-সংকুল একটি মাত্র দিবসের চিত্র। প্রভাতে আরম্ভ, মধ্য-রজনীতে সমাপ্ত। সন্ধ্যাদীপের সঙ্গে যেমন সকালে সল্‌তে-পাকানো অবিচ্ছেত্তরূপে সংযুক্ত, এই একটি দিনের সঙ্গে তেমনি জুড়ে গেছে গোটা ভারতবর্ষ—তার রাজনৈতিক অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল জবরদস্ত্ মুখ্যমন্ত্রী—এবং কবি; এবং আত্ম-সচেতন আত্ম-বিশ্বাসী পুরুষ। তিনি প্রদেশের কল্যাণ করেন, কিন্তু নিজের পুত্রদের কল্যাণে অবহেলা দেখান না; তিনি রোজ পূজা করেন, কিন্তু ভোগ-বিমুখ নন। যে নির্বাক বিবেকের সঙ্গে তাঁর সঙ্গোপন সংঘাত তার বাস্তব রূপায়ণ তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ঠিক ততোখানি, যতোখানি ব্যবধান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর বিবেকের মধ্যে। ঘটনাচক্রে জড়িত গান্ধীবাদী মন্ত্রী দুর্গাভাই দেশাই; আরও দুচার দশজন পেশাদার সার্থক রাজনৈতিক নেতা; মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান প্রতিপক্ষ সুদর্শন দুবে; উচ্চাভিলাষিণী সরোজিনী সহায়; ছায়াহীন পার্শ্বচর জগন্মোহন তিওয়ারী; একটি যুবক যার নাম চন্দ্রপ্রসাদ কোশল ও একটি যুবতী যার নাম বসন্ত; এবং মধ্য-রজনীর বোবা বিজলী-আলোয় হঠাৎ প্রকাশিত এক বাক্যহীনা রূপসী কবিসঙ্গিনী। পাদ-প্রদীপের সম্মুখে বিরাট মুক্ত-অঙ্গন নাট্যশালায় পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসী।

'মুখ্যমন্ত্রী' চাণক্যসেনের উপন্যাস রূপায়ণে অর্থপূর্ণ বলিষ্ঠ নতুন পদক্ষেপ। 'রাজপথ জনপথ' দিল্লী শহরকে প্রাণবন্ত করেছিল এক দিগন্ত-সন্ধানী আফ্রিকান নিগ্রোর অন্ধকার আলোক-সঞ্চারে। 'সে নহি সে নহি'-তে দুই ভারতীয় নারী, দুই ভারতীয়

ধারার, শান্ত, সলাজ সম্মেলন। 'মুখ্যমন্ত্রী' সাহিত্যের আসরে সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানসের দুঃসাহসিক সমীক্ষা। বিদগ্ধ পাঠকের চোখে এতদিনে চাণক্য সেনের সাহিত্যকৃতির প্রধান দিকগুলি প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যে কোনও নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশ ক্রমশঃ। প্রত্যেক উপন্যাস নতুন পদসঞ্চার। একে অন্যের পুনরাবৃত্তি নয়।

[তৃতীয় মুদ্রণ, দশ টাকা।

সে নহি সে নহি ॥ চাণক্য সেন

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এই বিরাট উপন্যাসখানি। সাম্প্রতিক কালে এরূপ উচ্চাশাপূর্ণ উপন্যাস নিঃসন্দেহে খুব অল্পই লেখা হয়েছে।

সমস্ত ভারতবর্ষের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এ উপন্যাসের প্রধান দুই নারী চরিত্র: তামিলনাদের সাবিত্রী আম্মা আর বাংলার দেববাণী।

নিজেদের বিচিত্র সমস্যা জীবনের মধ্যে তাঁরা বলছে ভারতীয় নারীজীবনের অর্ধ-শতাব্দীর বিপ্লবের কাহিনী। ব্যক্ত করছে আধুনিক নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

আজকের নারী বলছে— আমি দেবীও নই, নরকের দ্বারও নই—, আমি তোমারই মত মানুষ।

[তৃতীয় মুদ্রণ, দশ টাকা।

ক্লাসিক প্রেস

৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২